জলজ

ডক্টর ট্রিপল-এ

নীলা তার বাবাকে বলল, "আব্বু আমাকে একটা কুকুর ছানা কিনে দেবে?"

নীলার বাবা আবিদ হাসান অন্যমনস্কভাবে বললেন, "দেব।"

উত্তরটি শুনে নীলার সন্দেহ হল যে তার বাবা আসলে তার কথাটি ভালো করে শোনেন নি—সাধারণত শোনেন না। তাই ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য বলল, "আব্বু আমাকে একটা হাতির বাচ্চা কিনে দেবে?"

আবিদ হাসান তাঁর কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে আরো একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "দেব।"

নীলা এবারে গাল ফুলিয়ে বলল, "আব্বু, তুমি আমার কোনো কথা শোন না।"

আবিদ হাসান নীলার গলায় উত্তাপ লক্ষ করে এবারে সত্যি সত্যি তার দিকে মনোযোগ দিলেন। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "কে বলেছে শুনি না? এই যে শুনছি!"

"বল দেখি আমি কী বলেছি?"

"তুই বলেছিস তোকে একটা ইয়ে কিনে দিতে হবে।"

"কী কিনে দিতে হবে?"

"এই তো—কিছু একটা হবে—" বারো বছরের একটি মেয়ে কী চাইতে পারে ভেবে দেখার চেষ্টা করলেন এবং হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন সে সম্পর্কে তার জ্ঞান খুব সীমিত। ইতস্তত করে বললেন, "টেডি বিয়ার?"

নীলা এবারে সত্যি সত্যি রাগ করল, সে এখন আর বাচ্চা খুকি নয়, টেডি বিয়ারের বয়স অনেকদিন আগে পার হয়ে এসেছে কিন্তু তার নিজের বাবা এখনো সেটা জানে না। বাবার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "টেডি বিয়ার না, কুকুর ছানা।"

আবিদ হাসান নীলার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে বললেন, "কুকুর ছানা?"

"হ্যাঁ। এইটুকুন তুলতুলে কুকুর ছানা।"

আবিদ হাসান পুরো ব্যাপারটুকু হেসে উড়িয়ে দিতে গিয়ে তার আদরের মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। ব্যাপারটা সরাসরি উড়িয়ে দেওয়া যাবে না—একটু গুরুত্ব দিয়ে কথা বলে নিতে হবে। তিনি মুখে খানিকটা গাম্ভীর্য টেনে এনে বললেন, "একটা কুকুর ছানা কিন্তু একটা খেলনা নয়, জানিস তো?"

"জানি।"

"মজা ফুরিয়ে গেলে একটা খেলনা যেরকম সরিয়ে রাখা যায় একটা কুকুরের বেলায় কিন্তু সেটা করা যায় না।"

নীলা চোখ বড় বড় করে বলল, "জানি বাবা, সেজন্যই তো চাইছি।"

"বাসায় একটা কুকুর ছানা আনলে তাকে কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিতে হবে। খাওয়াতে হবে, পরিষ্কার রাখতে হবে, তার সাথে খেলতে হবে, তাকে বড় করতে হবে।"

"করব বাবা।" নীলা উজ্জ্বল চোখে বলল, "আমি যেখানেই যাব সেখানেই আমার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবে, কী মজা হবে!"

আবিদ হাসান মুখ আরো গম্ভীর করে বললেন, "এখন ভাবতে খুব মজা লাগছে, কিন্তু মনে রাখিস যখন তার পিছনে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিতে হবে তখন কিন্তু মজা উবে যাবে।"

"যাবে না।"

"তোর কুকুর ছানা যখন বাথরুম করবে, সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে। পারবি?"

নীলাকে এবারে একটু বিভ্রান্ত দেখাল, কুকুর ছানা যে বাথরুম করতে পারে এই ব্যাপারটি সে আগে ভেবে দেখে নি। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মুখ শক্ত করে বলল, "পারব আব্বু।"

আবিদ হাসান একটু হাসলেন, বললেন, "এখন বলা খুব সোজা, যখন সত্যি সত্যি করতে হবে তখন পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবি!"

নীলা তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলল, "যাব না বাবা—প্লিজ কিনে দাও!"

আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস ফেললেন। নীলা তার একমাত্র মেয়ে, খুব আদরের মেয়ে। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে, কখনো বাবা-মাকে জ্বালাতন করেছে বলে মনে পড়ে না। কোনো কিছু চাইলে না বলেছেন মনে পড়ে না, কিন্তু বাসায় একটা পোষা কুকুর সেটি তো অনেক বড় ব্যাপার, তার অর্থ জীবন পদ্ধতির সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাওয়া।

নীলা খুব আশা নিয়ে তার বাবার মুখের দিকে তাকাল, বলল, "দেবে আব্বু?"

আবিদ হাসান মেয়েকে নিজের কাছে টেনে এনে বললেন, "দেখ, একটা পোষা কুকুর আসলে বাসার নতুন একটা মানুষের মতো। এত মায়া হয়ে যাবে যে যদি কিছু একটা হয়ে যায় তা হলে কেঁদে কূল পাবি না।"

"কী হবে আব্বু?"

"এই ধর যদি হারিয়ে যায় কিংবা মরে যায়—"

"কেন হারিয়ে যাবে আব্বু? কেন মরে যাবে? আমি এত যত্ন করে রাখব যে তুমি অবাক হয়ে যাবে।"

আবিদ হাসান মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "তুই আরো কয়টা দিন একটু চিন্তা করে দেখ। এখনই ঠিক করে ফেলতে হবে কে বলেছে?"

কুকুরের বাচ্চার প্রস্তাবটা যখন নীলার মা মুনিরা হাসান শুনলেন তখন সেটা একেবারে এক কথায় নাকচ করে দিলেন। মুখ শক্ত করে বললেন, "ফাজলেমি পেয়েছ? এমনিতেই জান বের হয়ে যাচ্ছে এখন বাসায় একটা কুকুর নিয়ে আসবে? ছিঃ!"

নীলার মা মুনিরা হাসানের গলার স্বর সব সময় চড়া সুরে বাঁধা থাকে, তিনি নরম বা কোমল গলায় কথা বলেন না। কাজেই এক কথায় কুকুরের বাচ্চা পোষার শখটাকে বাতিল করে দেওয়ায় নীলার চোখে পানি টলটল করে উঠল এবং বলা যেতে পারে তখন আবিদ হাসান তার মেয়ের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। বললেন, "আহা, মুনিরা, ওরকম করে বলছ কেন? কুকুর-বেড়াল পোষা তো খারাপ কিছু না।"

মুনিরা কোমরে হাত দিয়ে বললেন, "এখন তুমিও মেয়ের সাথে তাল দিচ্ছ?"

"বেচারি একা একা থাকে, একটা সঙ্গী হলে খারাপ কী? পোষা পশুপাখি থাকলে একটা দায়িত্ব নেওয়া শিখবে।"

"বাসায় দায়িত্ব নেওয়ার জিনিসের অভাব আছে? ঘরদোর পরিষ্কার রাখতে পারে না? নিজের ঘরটা গুছিয়ে রাখতে পারে না? বাসার কাজকর্মে সাহায্য করতে পারে না?"

কাজেই নীলার কুকুর পোষার ব্যাপারটি আপাতত চাপা পড়ে গেল। বাবাকে নিজের পক্ষে পেয়ে নীলা অবশ্য এত সহজে হাল ছেড়ে দিল না, সে ধৈর্য ধরে লেগে রইল। আবিদ হাসান মেয়ের পক্ষ নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত মুনিরা একটু নরম হলেন এবং শেষ পর্যন্ত একদিন নীলা কুকুর পোষার অনুমতি পেল। অনুমতিটি হল সাময়িক—নীলার আম্মা খুব স্পষ্ট করে বলে রাখলেন যদি দেখা যায় নীলা ঠিক করে তার পোষা কুকুরের যত্ন নিতে পারছে না তা হলে সাথে সাথে কুকুর ছানাকে গৃহ ত্যাগ করতে হবে।

২

আবিদ হাসান একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করেন, বড় একটা প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে তাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে নীলাকে নিয়ে তার কুকুর ছানা কিনতে যাওয়ার সময় বের করতে বেশ বেগ পেতে হল। কুকুর ছানা কোথায় পাওয়া যায় সে সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই, আবিদ হাসান যখন ছোট ছিলেন তখন শীতের শুরুতে বেওয়ারিশ ছোট ছোট কুকুরের বাচ্চায় চারদিক ভরে উঠত। সেগুলো পোষা নিয়েও কোনো সমস্যা ছিল না। একবার তু তু করে ডাকলেই চিরদিনের জন্য ন্যাওটা হয়ে যেত। এখন দিনকাল পাল্টেছে, কুকুর ছানা কিনে আনতে হয়, ইনজেকশান দিতে হয়, ওষুধ খাওয়াতে হয়, মেজাজ-মর্জি বুঝে চলতে হয়। আবিদ হাসান অফিসে খোঁজ নিলেন এবং জানতে পারলেন কাটাবনের কাছে নাকি পোষা পশুপাখির দোকান রয়েছে। কাজেই একদিন সন্ধেবেলা নীলাকে নিয়ে তিনি কুকুরের বাচ্চা কিনতে গেলেন।

কাজটি যেরকম সহজ হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন দেখা গেল সেটা মোটেও তত সহজ নয়। কাটাবনে সারি সারি দোকান রয়েছে সত্যি কিন্তু সেখানে কুকুর বলতে গেলে নেই। এক দুটি দোকানে কিছু ঘেয়ো কুকুর ছোট খাঁচার মাঝে বেঁধে রাখা হয়েছে। দানাপানি না দিয়ে ছোট খাঁচার মাঝে বেঁধে রাখার ফলে তাদের মেজাজ হয়ে আছে তিরিক্ষে, কাছে যেতেই সবগুলো একসাথে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। খুঁজে পেতে একটা দোকানে একটা বিদেশী কুকুরের বাচ্চা পাওয়া গেল, এক সময় তার গায়ের রং নিশ্চয়ই ধবধবে সাদা ছিল কিন্তু এখন অযত্নে ময়লা হয়ে আছে। কুকুর ছানাটা নির্জীব হয়ে শুয়ে ছিল। নীলা কাছে গিয়ে ডাকাডাকি করেও তাকে দাঁড়া করাতে পারল না।

নীলা এবং আবিদ হাসান যখন কী করবেন সেটা নিয়ে কথা বলছেন তখন দোকানের একজন কর্মচারী তাদের দিকে এগিয়ে এল, বলল, "কুকুর কিনবেন?"

"হ্যাঁ। কুকুরের বাচ্চা।"

মানুষটি আবিদ হাসানের চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল চেষ্টা চরিত্র করে সে তার দোকানের কোনো কুকুর গছিয়ে দিতে পারবে না, তাই সেদিকে আর চেষ্টা করল না। বলল, "এভাবে তো ভালো কুকুর পাবেন না। সাপ্লাই তো কম। ঠিকানা-টেলিফোন রেখে যান ভালো বাচ্চা এলে খোঁজ দেব।"

"কবে আসবে?"

"কোনো ঠিক নাই। আজকেও আসতে পারে, এক মাস পরেও আসতে পারে।"

নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে আবিদ হাসানের মন খারাপ হল, জিজ্ঞেস করলেন, "আর কোনো কুকুরের দোকান নাই?"

"না। তবে—"

"তবে?"

"শুনেছি টঙ্গীর কাছে নাকি একটা পোষা কুকুরের ফার্ম খুলছে।"

"কুকুরের ফার্ম?" আবিদ হাসান খুব অবাক হলেন। "কুকুরের আবার ফার্ম হয় নাকি?"

"তাই তো শুনেছি। সব নাকি বিদেশী কুকুর।"

"তাই নাকি?"

"জে।"

"সেই ফার্মে কী হবে?"

"মাছের যেরকম চাষ হয় সেরকম কুকুরের চাষ হবে।" দোকানের কর্মচারী নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলল।

"কী হবে কুকুরের চাষ করে?"

"জানি না। কেউ বলে কোরিয়ায় কুকুরের মাংস রপ্তানি করবে। কেউ বলে ল্যাবরেটরিতে গবেষণার জন্য পাঠাবে। কেউ বলে পুলিশের কাছে বিক্রি করবে।"

আবিদ হাসান কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ফার্মটা কোথায়?"

"সেটা তো জানি না। শুনেছি টঙ্গীর কাছে আমেরিকান কোম্পানি।"

"নাম কী কোম্পানির?"

মানুষটা মুখ সুচালো করে নামটা মনে করার চেষ্টা করে বেশি সুবিধে করতে পারল না, তখন ভিতরে ঢুকে কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করে একটা ময়লা কাগজে নাম লিখে আনল, 'পেট ওয়ার্ল্ড'—পোষা প্রাণীর জগৎ।

আবিদ হাসান মেয়েকে কথা দিলেন পরের দিনই তিনি পেট ওয়ার্ল্ডের খোঁজ নেবেন।

আমেরিকান কোম্পানি হইচই করে বিদেশী কুকুরের একটা বিশাল ফার্ম বসালে সেটা খুঁজে পাওয়া সহজ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পেট ওয়ার্ল্ড খুঁজে বের করতে আবিদ হাসানের কালো ঘাম ছুটে গেল। আজ সকাল সকাল অফিস থেকে বের হয়েছেন, নীলাকে নিয়ে টঙ্গী এসে পেট ওয়ার্ল্ড খোঁজা শুরু করেছেন, সন্ধে ঘনিয়ে যাবার পর যখন তিনি আশা ছেড়ে দিয়েছেন তখন পেট ওয়ার্ল্ডের খোঁজ পাওয়া গেল। বড় রাস্তার পাশে বেশ বড় একটা জায়গা উঁচু দেয়াল এবং কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। ভিতরে জেলখানার মতো বড় একটা দালান। সামনে শক্ত লোহার গেট এবং গেটের পাশে ছোট পেতলের একটা নামফলক, সেখানে আরো ছোট করে ইংরেজিতে লেখা 'পেট ওয়ার্ল্ড'।

আবিদ হাসান গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তার গাড়ির হর্ন বাজালেন। বার দুয়েক শব্দ করার পর প্রথমে গেটের উপরে ছোট চৌকোনা একটা জানালা খুলে গেল। সেখান থেকে একজন মানুষ উঁকি দিয়ে তাকে দেখল, তারপর গেটের পাশ থেকে নিরাপত্তারক্ষীর পোশাক পরা একজন মানুষ বের হয়ে এল, আবিদ হাসানের কাছে এসে দাঁড়িয়ে মানুষটি জিজ্ঞেস করল, "কাকে চান?"

আবিদ হাসান একটু বিপন্ন অনুভব করলেন, তার মনে হল তিনি বুঝি কোনো ভুল জায়গায় চলে এসেছেন। একটু ইতস্তত করে বললেন, "আসলে আমি একটা কুকুর ছানা কিনতে এসেছি।"

নিরাপত্তারক্ষীর পোশাক পরা মানুষটি কঠিন মুখে বলল, "এখানে কুকুর ছানা বিক্রি হয় না।"

"আমাকে একজন বলল এখানে নাকি কুকুরের ফার্ম তৈরি হয়েছে।"

মানুষটি নিষ্পলক চোখে আবিদ হাসানের দিকে তাকিয়ে থেকে গলায় খানিকটা অনাবশ্যক রূঢ়তা ঢেলে বলল, "আমি আপনাকে বলেছি, এখানে কুকুর বিক্রি হয় না।"

মানুষটির ব্যবহারে আবিদ হাসান অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তিনি রুষ্ট গলায় বললেন, "তা হলে এখানে কী হয়?"

নিরাপত্তারক্ষীর পোশাক পরা মানুষটি আবিদ হাসানের কথার উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল না। সে পিছন ফিরে তার গেটের কাছে ফিরে যেতে থাকে, ঠিক তখন তার কোমরে ঝোলানো ওয়াকিটকিতে কেউ একজন তার সাথে যোগাযোগ করল। মানুষটি ওয়াকিটকিটি মুখের কাছে ধরে বাক্য বিনিময় শুরু করে, কী নিয়ে কথা বলছে সেটি শুনতে না পেলেও আবিদ হাসান বুঝতে পারলেন মানুষটি তাকে নিয়ে কথা বলছে। এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন, কারণ তিনি দেখতে পেলেন নিরাপত্তারক্ষী মানুষটি তার দিকে এগিয়ে আসছে।

"আপনি ভিতরে যান।"

আবিদ হাসান ভুরু কুঁচকে বললেন, "এখানে যদি কুকুর বিক্রি না হয় তা হলে আমি গিয়ে কী করব?"

নিরাপত্তারক্ষীর পোশাক পরা মানুষটি আবিদ হাসানের উষ্মাটুকু হজম করে নিয়ে তার হাতের স্বয়ংক্রিয় একটা সুইচে চাপ দিতেই সামনের গেটটি ঘরঘর শব্দ করে খুলতে শুরু করে। তার গাড়িটা যাওয়ার মতো জায়গা করে গেটটা থেমে গেল। আবিদ হাসান গাড়ি ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

গাড়ি ভিতরে ঢুকতেই নীলা বলল, "কী সুন্দর! দেখেছ আব্বু?"

আবিদ হাসান মাথা নাড়লেন, সত্যিই সুন্দর। বাইরে থেকে বোঝা যায় না ভিতরে এত জায়গা। সুবিস্তৃত লনে গাছগাছালি এবং ফুলের বাগান, পিছনে বিশাল আলোকোজ্জ্বল দালান। পুরো জায়গাটুকুতে এক ধরনের দীর্ঘ পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে, আবিদ হাসানের মনে হল তিনি বুঝি পাশ্চাত্যের কোনো একটি বড় করপোরেট অফিসে ঢুকে গেছেন।

গাড়ি পার্ক করার জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেখানে গাড়ি রেখে আবিদ হাসান নীলার হাত ধরে খোয়া বাঁধানো হাঁটা পথে মূল দালানে পৌঁছলেন। বড় কাচের স্লাইডিং দরজার সামনে দাঁড়াতেই সেটা নিঃশব্দে খুলে গেল। আবিদ হাসান ভিতরে পা দিতেই কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের আরামদায়ক অনুভূতি তার সারা শরীর জুড়িয়ে দিল। দরজার অন্যপাশে একজন তরুণী দাঁড়িয়ে ছিল, আবিদ হাসান এবং নীলাকে দেখে সে তাদের দিকে এগিয়ে এল। মেয়েটির ফোলানো চুল এবং পরিমিত প্রসাধন চেহারায় এক ধরনের আকর্ষণীয় এবং মাপা কমনীয়তা নিয়ে এসেছে। মেয়েটি মিষ্টি করে হেসে বলল, "আসুন। আমি জেরিন। পেট ওয়ার্ল্ডে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

"আমি আবিদ হাসান আর এ হচ্ছে আমার মেয়ে নীলা।"

"আসুন মি. হাসান। আপনার জন্য ডক্টর আজহার অপেক্ষা করছেন।"

"ডক্টর আজহার?"

"হ্যাঁ। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এই পুরো প্রজেক্টটা ডক্টর আজহারের ব্রেইন চাইল্ড।"

আবিদ হাসান বড় একটা হলঘরের ভিতর দিয়ে হেঁটে একটা লিফটের সামনে দাঁড়ালেন। বোতাম স্পর্শ করামাত্র লিফটের দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। জেরিন আবিদ হাসান এবং নীলাকে নিয়ে লিফটে করে সাত তলায় এসে একটা দীর্ঘ করিডোর ধরে হেঁটে বড় একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল। দরজার পাশে একটা সেক্রেটারিয়েট ডেস্ক, সেখানে ইন্টারকমে চাপ দিয়ে জেরিনা নিচু গলায় বলল, "স্যার, আপনার গেস্টদের নিয়ে এসেছি।"

আবিদ হাসান ইন্টারকমে একটা মোটা গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন, "ভিতরে নিয়ে এস।"

জেরিন দরজা ঠেলে খুলে দিয়ে আবিদ হাসান এবং নীলাকে ভিতরে যেতে ইঙ্গিত করল। আবিদ হাসান নীলার হাত ধরে ভিতরে ঢুকলেন। বিশাল একটি অফিস ঘর, অন্যপাশে একটা বড় ডেস্কে পা তুলে একজন মানুষ তার রিভলবিং চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে কিছু একটা পড়ছিল, আবিদ হাসান এবং নীলাকে ঢুকতে দেখে মানুষটি পা নামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে এগিয়ে এল। এ রকম বিশাল একটি প্রতিষ্ঠান যার পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে সেই মানুষটিকে তুলনামূলকভাবে বেশ কম বয়স্ক মনে হল—আবিদ হাসান থেকে বড়জোর বছর পাঁচকের বড় হবে। মানুষটি দীর্ঘদেহী এবং সুদর্শন, চোখে সূক্ষ্ম ধাতব রীমের চশমা। মাথায় এলোমেলো চুল, গায়ের রং অস্বাভাবিক ফর্সা—এই বয়সেও রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে যায় নি।

মানুষটি লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এসে আবিদ হাসানের সাথে করমর্দন করে বলল, "আমি আসিফ আহমেদ আজহার। আমার বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে ট্রিপল-এ।"

আবিদ হাসান হাসলেন, "ভাগ্যিস আপনি আমেরিকাতে নেই, তা হলে যত ভাঙা পাড়ি তাদের ড্রাইভারের ফোনের উত্তর দিতে দিতে আপনার জান বের হয়ে যেত।"

যুক্তরাষ্ট্রের মোটর গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিষ্ঠান আমেরিকান অটোমোবাইল এসোসিয়েশানের নামের আদ্যক্ষরের সাথে ডক্টর আজহারের নামের মিলটুকু আবিদ হাসান ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছেন দেখে মানুষটি বেশ সন্তুষ্ট হল। সে আবিদ হাসান এবং নীলাকে তার ডেস্কের সামনে রাখা গদিসাঁটা চেয়ারে বসিয়ে নিজের জায়গায় বসে আবিদ হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবহারের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

আবিদ হাসান ঠিক কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। ভদ্রতাসূচক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই ডক্টর আজহার বলল, "আমি অবশ্য সিকিউরিটি গার্ডের দোষও দিতে পারছি না। আমরা বেছে বেছে এমন মানুষকে সিকিউরিটি গার্ডের দায়িত্বে দেই যাদের আই. কিউ. খুব বেশি নয়। খানিকটা রোবটের মতো মানুষ! তাদের কাছে খুব ভদ্রতা আশা করাও অন্যায় হবে।"

আবিদ হাসান মানুষটিকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করতে থাকলেন। মানুষটির সদ্যপ্রতিভ আন্তরিক কথাবার্তার পরেও তার ভিতরে কিছু একটা তাকে এক ধরনের অস্বস্তির মাঝে ফেলে দেয়। মানুষটি এবারে হঠাৎ করে নীলার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী খাবে বল? আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিংকস, হট চকলেট?"

নীলা আইসক্রিম খুব পছন্দ করে কিন্তু সেটা মুখ ফুটে বলল না, মাথা নেড়ে বলল, "কিছু খাব না।"

"কিছু একটা তো খেতে হবে।" মানুষটি নীলার দিকে চোখ মটকে বলল, "ঠিক আছে আইসক্রিমই হোক। আমার কাছে খুব ভালো আইসক্রিম আছে। স্ট্রবেরি উইথ হেজল নাট।"

ইন্টারকমে চাপ দিয়ে এই সদ্যপ্রতিভ মানুষটি নীলার জন্য আইসক্রিম এবং তাদের দুজনের জন্য কফির কথা বলে আবার আবিদ হাসানের দিকে ঘুরে তাকাল। আবিদ হাসান একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—আপনি কি শুধু সিকিউরিটি গার্ডের হয়ে ক্ষমা চাইবার জন্য আমাদের ডেকেছেন?"

মানুষটি হা হা করে হেসে উঠে বলল, "না। আমি সে জন্য আপনাদের কষ্ট দিই নি। আমাদের এই ফ্যামিলিটির সিকিউরিটি সিস্টেম একেবারে স্টেট অফ দি আর্ট। আমি এখানে বসে সবকিছু মনিটর করতে পারি। ঘটনাক্রমে আমি আপনার সাথে গার্ডের কথা শুনতে পেরেছি। আপনি আপনার মেয়ের জন্য একটা কুকুর ছানা খুঁজছেন।"

"হ্যাঁ। সারা ঢাকা শহর খুঁজে আমি একটা ভালো কুকুর ছানা পেলাম না।"

"পাবেন না।" মানুষটি সোজা হয়ে বলল, "যে দেশে মানুষ খেতে পায় না সে দেশে কুকুর আপনি কেমন করে পাবেন?"

আবিদ হাসান একটু অবাক হয়ে বললেন, "তা হলে আপনারা এত হইচই করে কুকুরের ফার্ম কেন খুলেছেন?"

"এক্সপোর্টের জন্য। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে পোষা পশুপাখির বিশাল মার্কেট। মাল্টি বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি। আমরা সেই মার্কেটটা ধরতে চাই।"

আবিদ হাসানকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল, তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "আমি বিজনেস বুঝি না। কিন্তু কমনসেন্স থেকে মনে হয় এখানে কুকুরের ফার্ম করে সেই কুকুরকে বিদেশে রপ্তানি করা কিছুতেই একটা লাভজনক ব্যবসা হতে পারে না।"

ডক্টর আজহার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই জেরিন একটা সুন্দর ট্রে করে দুই মগ কফি এবং একটা গবলেটে আইসক্রিম নিয়ে এসে ঢুকল। টেবিলে তাদের সামনে সেগুলো সাজিয়ে রেখে চলে যাবার পর ডক্টর আজহার কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, "আপনি বলছেন বিজনেস বোঝেন না, কমনসেন্স থেকে বলছেন কিন্তু বিজনেস মানেই হল কমনসেন্স। আপনি ঠিকই বলেছেন এখান থেকে সাধারণ কুকুর রপ্তানি করা লাভজনক ব্যবসা নয়।"

"তা হলে?"

"আমরা সাধারণ কুকুর রপ্তানি করব না।"

"তা হলে কী ধরনের কুকুর?"

"জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে আমরা এমন একটি প্রজাতি দাঁড়া করিয়েছি সারা পৃথিবীতে তার কোনো জুড়ি নেই।"

আবিদ হাসান ভুরু কুঁচকে তাকালেন, "কিসে জুড়ি নেই?"

"বুদ্ধিমত্তায়।"

"বুদ্ধিমত্তা?"

"হ্যাঁ। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা।"

আবিদ হাসান ডক্টর আজহারের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমি বুঝতে পারছি না, জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে আপনি কুকুরের বুদ্ধিমত্তা কীভাবে বাড়াবেন?"

"আমার পিএইচডি থিসিসের নাম ছিল 'আইসোলেশান অফ জিন্স রেসপন্সিবল অফ ইনটেলিজেন্স ইন কেনাইন ফেমিলি।' অর্থাৎ কুকুরের বুদ্ধিমত্তা জিনটি আলাদা করা।"

"কুকুরের বুদ্ধিমত্তায় একটি জিন্স আছে?"

ডক্টর আজহার হাত নেড়ে বলল, "এই আলোচনাগুলো আসলে কফি খেতে খেতে শেষ করা সম্ভব না, হ্যাঁ এবং না দিয়েও এর উত্তর হয় না। তবে আপনি যদি জানতে চান আপনাকে বলতে পারি, বুদ্ধিমান কুকুরের জিন্স আলাদা করে অসাধারণ বুদ্ধিমান কুকুর তৈরি করায় আমার একটা পেটেন্ট রয়েছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। সেই পেটেন্ট দেখে আমেরিকায় একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল। পুরো দেড় বছর আলাপ-আলোচনা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত এখানে পেট ওয়ার্ড তৈরি হয়েছে।"

"চমৎকার।" আবিদ হাসান বললেন, "আপনাকে অভিনন্দন।"

"এখন অভিনন্দন দেবেন না। পুরোটুকু দাঁড়িয়ে যাক, স্টেটসে প্রথম শিপমেন্ট পাঠাই তারপর দেবেন।"

"প্রথম শিপমেন্টের কত বাকি?"

"অনেক। মাত্র প্রথম কয়েকটি টেস্ট কেস তৈরি হয়েছে। চমৎকার কয়েকটা কুকুর ছানার জন্ম হয়েছে।"

নীলা এতক্ষণ চুপ করে তার আব্বুর সাথে ডক্টর আজহারের কথা শুনছিল, এবারে প্রথমবার কথা বলে উঠল, "সত্যি?"

ডক্টর আজহার নীলার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল, "হ্যাঁ, সত্যি। প্রথম কেসগুলো করেছি টেরিয়ার দিয়ে। আস্তে আস্তে শার্পে, সিটজ্ করে ল্যাব্রাডোর যাব। স্টেটসে ল্যাব্রাডোর প্রজাতি খুব পপুলার।"

নীলা একবার তার বাবার মুখের দিকে তাকাল, তারপর ডক্টর আজহারের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কুকুর ছানাগুলো বিক্রি করবেন?"

ডক্টর আজহার চোখ বড় বড় করে নীলার দিকে তাকিয়ে বলল, "কিনবে তুমি?"

নীলা মাথা নাড়ল এবং সাথে সাথে ডক্টর আজহার হা হা করে হেসে উঠে বলল, "আমাদের এই কুকুর ছানাগুলোর দাম কত জান?"

নীলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কত?"

"রিটেল মার্কেট—অর্থাৎ খোলা বাজারে সাড়ে সাত হাজার ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশের টাকায় তিন লাখ থেকে বেশি!"

নীলার মুখটি সাথে সাথে আশাভঙ্গের কারণে ম্লান হয়ে যায়। পুরো ব্যাপারটাকে তার কাছে এক ধরনের দুর্বোধ্য এবং নিষ্ঠুর রসিকতা বলে মনে হতে থাকে। ডক্টর আজহার নীলার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বলল, "আছে তোমার কাছে তিন লাখ টাকা?"

নীলা কিছু বলল না। ডক্টর আজহার সোজা হয়ে বসে হঠাৎ গলার স্বরে এক ধরনের গুরুত্বের ভাব এনে বলল, "তোমার মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই, কারণ একটু আগে তোমার বাবার সাথে তোমাকে দেখে আমার মাথায় একটা চমৎকার আইডিয়া এসেছে। সে জন্য তোমাদের এখানে ডেকে এনেছি।"

নীলার চোখ হঠাৎ চকচক করে ওঠে, "কী আইডিয়া?"

"আমাদের এই কুকুর ছানাগুলোকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তারা কতটুকু বুদ্ধিমান হয়েছে, মানুষের সাথে থাকতে তারা কত পছন্দ করে, সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে গবেষণা করতে হবে। সেটা করার সবচেয়ে ভালো উপায় কী জান?"

"কী?"

"তাদের কোনো একটি ফ্যামিলির সাথে থাকতে দেওয়া। কাজেই যদি দেখা যায় তুমি সেরকম একটা ফ্যামিলির মেয়ে তা হলে তোমাকে আমরা একটা কুকুর ছানা দিয়ে দেব।"

"সত্যি?" নীলা আনন্দে চিৎকার করে উঠে বলল, "সত্যি?"

"সত্যি। শুধু একটি ব্যাপার।"

"কী ব্যাপার?"

"কুকুর ছানাটিকে পোষার ব্যাপারে আমাদের কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। আর—"

"আর?"

"আর মাঝে মাঝে কুকুর ছানাটিকে আমাদের পরীক্ষা করতে দিতে হবে। রাজি?"

নীলা "রাজি" বলে চিৎকার করতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে থেমে তার আব্বুর দিকে অনুমতির জন্য তাকাল। আবিদ হাসান হেসে মাথা নেড়ে অনুমতি দিলেন। সাথে নীলা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, "রাজি!"

"চমৎকার।" ডক্টর আজহারের গলার স্বর আবার গম্ভীর হয়ে আসে, সে একটু সামনে ঝুঁকে বলল, "তা হলে তোমার আব্বুর সাথে কিছু কাগজপত্র তৈরি করে নেওয়া যাক। কাল ভোরে তোমার বাসায় চমৎকার একটা আইরিশ টেরিয়ার কুকুর ছানা চলে আসবে।"

নীলা চকচকে চোখে বলল, "আমি কি আমার কুকুর ছানাটিকে দেখতে পারি?"

ডক্টর আজহার এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল, তারপর বলল, "এস আমার সাথে।"

ডক্টর আজহারের পিছু পিছু আবিদ হাসান এবং নীলা একটি বড় হলঘরে হাজির হল। ঘরের দেয়ালে অনেকগুলো বড় বড় টেলিভিশন স্ক্রিন। একেকটা স্ক্রিনে একেকটি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য। কোনোটিতে বড় একটি ল্যাবরেটরিতে মানুষেরা কাজ করছে, কোথাও বড় গুদামঘর থেকে জিনিসপত্র সরানো হচ্ছে, কোথাও খাঁচায় রাখা বড় বড় কুকুর, কোথাও বিচিত্র ধরনের যন্ত্রপাতি। ডক্টর আজহার সুইচপ্যানেল স্পর্শ করতেই একটা স্ক্রিনের দৃশ্য পাল্টে যায় এবং সেখানে ধবধবে সাদা কুকুর ছানার ছবি ফুটে ওঠে। কুকুর ছানাটি স্থির দৃষ্টিতে কোথায় জানি তাকিয়ে আছে।

ডক্টর আজহার নীলাকে বলল, "এই যে, তোমার কুকুর ছানা।"

নীলা বুকের মাঝে আটকে রাখা নিশ্বাসটি বের করে দিয়ে বলল, "ইস্! কী সুন্দর!"

আবিদ হাসানকেও স্বীকার করতে হল কুকুর ছানাটি সত্যিই ভারি সুন্দর! শিশু—তা সে মানুষেরই হোক আর পশুপাখিরই হোক, সব সময়ই সুন্দর।

৩

নীলার কুকুর ছানা নিয়ে মুনিরা হাসানের প্রকাশ্যে এবং আবিদ হাসানের গোপনে যেটুকু দুশ্চিন্তা ছিল পেট ওয়ার্ল্ডের কাজকর্ম দেখে তার পুরোটাই দূর হয়ে গেল। পেট ওয়ার্ল্ড যে নীলার জন্য শুধু একটি ধবধবে সাদা কুকুর ছানা দিয়ে গেল তা নয়, কুকুর ছানাটিকে দেখেশুনে রাখার জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল। তারা বাসার সামনে মোল্ডেড প্লাস্টিকের সুন্দর ঘর, প্রথম তিন মাসের খাবার এবং ওষুধপত্র, কুকুর ছানা পরিচর্যা করার উপরে বই, কাগজপত্র এমনকি একটা ভিডিও এবং কুকুর ছানার বুদ্ধিমত্তা বিকাশের জন্য কী কী করতে হবে সেসব ব্যাপারেও নীলার সাথে আলাপ করে গেল। কুকুর

ছানার দৈনন্দিন তথ্য পাঠানোর জন্য একটি ই-মেইল একাউন্ট এমনকি জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ করার জন্য সার্বক্ষণিক একটি টেলিফোন নম্বরও দিয়ে গেল।

কয়েকদিনের মাঝেই কুকুর ছানাটির উপস্থিতিতে বাসার সবাই মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে যায়। কুকুর ছানাটি শান্ত এবং আমুদে। নীলার মনোরঞ্জনের জন্য খুব ব্যস্ত এবং অত্যন্ত সুবোধ। কোন জিনিসটি করতে পারবে এবং কোন জিনিসটি করতে পারবে না সেটি একবার বলে দেওয়া হলেই কুকুর ছানাটি সেটি মনে রাখে এবং মেনে চলে। সারা রাত জেগে থেকে কেউকেউ চিৎকার করে সারা বাড়ি মাথায় তুলে সবার জীবন অতিষ্ঠ করে দেবে বলে যে ভয়টা ছিল দেখা গেল সেটা পুরোপুরি অমূলক। রাতে ঘুমানোর সময় কুকুর ছানাটিকে তার ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়ামাত্রই সে দুই পায়ের মাঝে মাথা ঢুকিয়ে ব্যাপারটি মেনে নেয়।

কুকুর ছানাটির কী নাম দেওয়া যায় সেটি নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা হল এবং শেষ পর্যন্ত নীলার যে নামটি পছন্দ সেটি হচ্ছে 'টুইটি'। আবিদ হাসানের ধারণা ছিল এই নামটিতে অভ্যস্ত হতে কুকুর ছানা সপ্তাহখানেক সময় নেবে কিন্তু দেখা গেল এক বেলার মাঝে কুকুর ছানাটি তার নতুন নামে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে সত্যি সত্যি কুকুরের মাঝে বুদ্ধিমান প্রজাতি তৈরি করা সম্ভব সেটি আবিদ হাসান এই প্রথমবার একটু একটু বিশ্বাস করতে শুরু করলেন।

কিছুদিনের মাঝেই বাসার সবাই কুকুর ছানা 'টুইটি'কে বেশ পছন্দ করে ফেলল। নীলা স্কুল থেকে আসার পরই টুইটিকে নিয়ে ছোটাছুটি করে। সত্যি কথা বলতে কী, আবিদ হাসানও বিকেলবেলা টুইটি নামের এই আইরিশ টেরিয়ার কুকুর ছানাটিকে নিয়ে খানিকক্ষণ খেলার জন্য বেশ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন। মুনিরা হাসান যদিও নিজে থেকে এখনো টুইটির সাথে কোনো রকম মাখামাখি করেন নি, কিন্তু বারান্দায় বসে থেকে তার স্বামী এবং কন্যাকে এই কুকুর ছানাটিকে নিয়ে বড় ধরনের হইচই করতে দেখা বেশ পছন্দই করেন। নির্বোধ পশুপাখি সম্পর্কে তার যেরকম একটি ধারণা ছিল টুইটিকে কাছাকাছি দেখে তার বেশ একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে।

আবিদ হাসান যেটুকু জানেন সে অনুযায়ী পেট ওয়ার্ল্ড এখনো পুরোপুরি ব্যবসা শুরু করে নি। ডক্টর আজহারের সাথে কথা বলে যেটুকু বুঝেছিলেন তাতে মনে হয় মোটামুটি নিয়মিতভাবে বুদ্ধিমান প্রজাতির কুকুর ছানা তৈরি করতে শুরু করার এখনো বছর দুয়েক সময় বাকি। যে কোনো ব্যবসার গোড়ার দিকে একটা সময় থাকে যখন সেটি দাঁড়া করানোর জন্য তার পিছনে প্রচুর টাকা ঢালতে হয়। পেট ওয়ার্ল্ড সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই ভালোভাবে প্রস্তুত। তারা শুধু যে তাদের প্রতিষ্ঠানটিকে চালিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, টঙ্গীর আশপাশে বেশ কিছু দাতব্য সেবা প্রতিষ্ঠানও খুলেছে। সেখানে গরিব মানুষজন বিনা খরচে চিকিৎসা পেতে পারে, বিশেষ করে সন্তানসম্ভবা মায়েদের চিকিৎসার খুব ভালো এবং আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। আমেরিকান বড় করপোরেশনগুলো স্থানীয় এলাকায় সবসময়েই এ ধরনের নানারকম আয়োজন করে থাকে, তার সবগুলোই যে মানুষের জন্য ভালবাসার কারণে হয়ে থাকে তা নয়। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষজনের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা জাতীয় ব্যাপারগুলোই আসলে মূল উদ্দেশ্য। নিজেরা যখন বিশাল অর্থের পাহাড় গড়ে তুলবে তখন তার একটি অংশ যদি গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য খরচ করা হয় খারাপ কী?

দেখতে দেখতে তিন মাস পার হয়ে গেল। টুইটিকে নিয়ে প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটুকু কেটে যাবার পরও নীলার উৎসাহে এতটুকু ভাটা পড়ে নি। সফটওয়্যার নিয়ে নতুন একটা প্রজেক্ট

শুরু করার পর আবিদ হাসান হঠাৎ করে বাড়াবাড়ি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, মাঝখানে তাকে কয়েক সপ্তাহের জন্য জার্মানিও যেতে হল। জার্মানি থেকে ফিরে আসার সময় এবারে তার স্ত্রী এবং কন্যার জন্য ছোটখাটো উপহারের সাথে সাথে টুইটির জন্যও একটা উপহার কিনে আনলেন—একটা ফ্লী-কলার, কুকুরের গলায় বেঁধে রাখলে তার শরীরে উকুন হয় না!

জার্মানি থেকে ফিরে এসে অনেকদিন পরে রাত্রে একসাথে খেতে বসে আবিদ হাসান তার মেয়ের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। স্কুলের খবর, বন্ধুবান্ধবের খবর দিয়ে নীলা টুইটির খবর দিতে শুরু করল। বলল, "আব্বু, টুইটি যা দুষ্টু হয়েছে তুমি সেটা বিশ্বাস করবে না।"

নীলার গলায় অবশ্য টুইটির বিরুদ্ধে যেটুকু অভিযোগ তার চাইতে অনেক বেশি মমতার ছাপ ছিল। আবিদ হাসান মুখ টিপে হেসে বললেন, "কী দুষ্টুমি করেছে, শুনি?"

"তাকে গল্প না বললে খেতে চায় না।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, কিসের গল্প শুনতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে বল দেখি?"

"কিসের?"

"একটা ছোট বাচ্চা আর তার মায়ের গল্প।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

নীলা আদুরে গলায় বলল, "আচ্ছা আব্বু বল, প্রত্যেকদিন কি গল্প বলা যায়?"

আবিদ হাসান মাথা নাড়লেন, "ঠিকই বলেছিস। এভাবে চলতে থাকলে তো তোর কুকুর ছানাকে পড়ার জন্য নার্সারি স্কুলে পাঠাতে হবে!"

নীলা হেসে ফেলল, বলল, "না আব্বু কুকুরকে নার্সারি স্কুলে পাঠাতে হবে না। আমি অনেক চেষ্টা করে দেখেছি টুইটির পড়াশোনায় কোনো উৎসাহ নেই। 'ডাবলিউ' আর 'এম' উল্টাপাল্টা করে ফেলে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। আর কিছুতেই নয়ের বেশি গুনতে পারে না। দশ লিখলেই টুইটির মাথা আউলা-ঝাউলা হয়ে যায়! একবার বলে এক আরেকবার বলে শূন্য।"

আবিদ হাসান হঠাৎ একটু অবাক হয়ে নীলার দিকে তাকালেন, এতক্ষণ টুইটির সম্পর্কে যেসব কথা বলে গেছে তার কোনোটাই তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে নেন নি, নীলার শেষ কথাটি শুনে তিনি রীতিমতো চমকে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলি তুই?"

নীলা গাল ফুলিয়ে বলল, "তার মানে তুমি আমার কোনো কথা শোন নি?"

"কে বলেছে শুনি নি। সব শুনেছি।"

"তা হলে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"তুই সত্যি বলেছিস নাকি ঠাট্টা করছিস জানার জন্য।"

"ঠাট্টা করব কেন?" নীলা মুখ গম্ভীর করে বলল, "তোমার মনে নেই টুইটির দাম সাড়ে সাত হাজার ডলার? সে সবকিছু বোঝে।"

"পাগলী মেয়ে, দাম বেশি হলেই সবকিছু বুঝবে কে বলেছে? সবকিছুর একটা সীমা থাকে। খুব বুদ্ধিমান কুকুরেরও বুদ্ধির একটা সীমা থাকবে।"

নীলা বুক ফুলিয়ে বলল, "আমার টুইটির বুদ্ধির কোনো সীমা নেই।"

"তুই যা বলেছিস সেটা সত্যি হলে আসলেই তোর টুইটির বুদ্ধির কোনো সীমা নেই।"

"তুমি কী বলছ আব্বু? আমি কি তোমাকে মিথ্যে বলেছি?"

"ইচ্ছে করে হয়তো বলিস নি—কিন্তু যেটা বলছিস সেটা সত্যি হতে পারে না। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী খুব বেশি দূর শুনতে পারে না।"

নীলা মুখ গম্ভীর করে বলল, "টুইটি পারে। আমি তোমাকে দেখাব।"

"ঠিক আছে।" আবিদ হাসান খেতে খেতে বললেন, "যেটা হয়েছে সেটা এ রকম, তোর টুইটি কিছু শব্দ শুনে কিছু কাজ করে, শব্দগুলো যে সংখ্যা সেটা সে জানে না। অনেকটা ময়না পাখির কথা বলার মতো। ময়না পাখি যে কথা বলে সেটা তারা বুঝে বলে না—তারা শুধু এক ধরনের শব্দ করে। বুঝেছিস!"

নীলা বলল, "আমি বুঝেছি আব্বু, তুমি কিছু বোঝ নি।"

মুনিরা হাসান এবারে মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, "অনেক হয়েছে। এখন দুজনেই কথা বন্ধ করে খাও।"

পরদিন অফিস থেকে এসে আবিদ হাসান টুইটির বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করতে বসলেন। নীলাকে ডেকে বললেন, "নিয়ে আয় দেখি টুইটিকে।"

নীলা গলা উঁচিয়ে ডাক দিল, "টু-ই-টি।"

সাথে সাথেই বাসার পিছন থেকে টুইটি ছুটে এসে নীলাকে ঘিরে লাফাতে শুরু করল। আবিদ হাসান একটু অবাক হয়ে দেখলেন টুইটি এর মাঝে বেশ বড় হয়েছে, তার মাঝে কুকুর ছানা কুকুর ছানা ভাব আর নেই। নীলা আঙুল উঁচিয়ে বলল, "আব্বু তোকে এখন পরীক্ষা করে দেখবে। বুঝেছিস?"

আবিদ হাসান সকৌতুকে দেখলেন মানুষ যেভাবে সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে, টুইটি ঠিক সেভাবে মাথা নাড়ল—যেন সে সত্যি সত্যি নীলার কথা বুঝতে পেরেছে। নীলা বলল, "আমি যখন বলব 'এক' তখন তুই একবার পা উপরে তুলবি, এইভাবে—" বলে নীলা তার নিজের পা উপরে তুলল, "বুঝেছিস?"

টুইটি তার পা একবার উপরে তুলল, তারপর হ্যাঁ-সূচকভাবে মাথা নাড়ল। নীলা এবার জোরে জোর বলল, "এক।"

টুইটি তখন তার পা'টি একবার উপরে তুলে আবার নামিয়ে আনে। নীলা বলল "দুই" তখন টুইটি তার পা'টি একবার উপরে তুলে নিচে নামিয়ে আনে তারপর আবার দ্বিতীয়বার উপরে তুলে নিচে নামিয়ে আনে। নীলা এবারে বলল, "তিন" টুইটি সত্যি সত্যি তিনবার তার পা উপরে তুলে নিচে নামিয়ে আনে। নীলা এইভাবে গুনে যেতে থাকে এবং প্রত্যেকবারই টুইটি সঠিক সংখ্যকভাবে তার পা উপরে তুলে এবং নিচে নামিয়ে আনে। 'আট' পর্যন্ত গিয়ে অবশ্য গুলিয়ে ফেলল এবং প্রথমবার ভুল করে ফেলল। নীলা হাল ছেড়ে না দিয়ে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে যাচ্ছিল, আবিদ হাসান তাকে থামালেন, বললেন, "আর করতে হবে না। আমি দেখেছি।"

"কী দেখেছ?"

"দেখেছি যে তুই কিছু একটা বললে সে কিছু একটা করতে পারে। এটা হচ্ছে এক ধরনের ট্রেনিং, টুইটি এটা না বুঝে করছে।"

নীলা বলল, "কী বলছ তুমি আব্বু? টুইটি না বুঝে কিছু করে না। তুমি দেখতে চাও?"

"দেখা।"

নীলা এবারে টুইটির দিকে তাকিয়ে বলল, "টুইটি তুই কাঠি চিনিস? কাঠি?"

আবিদ হাসান অবাক হয়ে দেখলেন টুইটি না-সূচকভাবে মাথা নাড়ল। নীলা তখন খুঁজে একটা কাঠি বের করে হাতে নিয়ে বলল, "এই যে এইটা হচ্ছে কাঠি। বুঝেছিস?"

টুইটি হ্যাঁ-সূচকভাবে মাথা নাড়ল। নীলা বলল, "যা, এইবারে খুঁজে খুঁজে পাঁচটা কাঠি নিয়ে আয়।"

টুইটি সাথে সাথে লেজ নেড়ে বাগানের দিকে ছুটে গেল এবং খুঁজে বের করে একটা কাঠি নিয়ে ছুটে এসে নীলার পায়ের কাছে রেখে দিয়ে আবার বাগানের দিকে ছুটে গেল। এইভাবে সত্যি সত্যি সে পাঁচটা কাঠি খুঁজে খুঁজে নীলার পায়ের কাছে এনে হাজির করল। নীলা এবারে যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গি করে বলল, "দেখেছ, আব্বু?"

আবিদ হাসান এবারে সত্যি অবাক হলেন। কুকুর কত পর্যন্ত গুনতে পারে তিনি জানেন না, কিন্তু সংখ্যাটি বেশি হবার কথা নয়। নীলাকে নিয়ে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে টুইটিকে পরীক্ষা করে সত্যি সত্যি হতবাক হয়ে গেলেন। এটি শুধু যে গুনতে পারে তাই নয়, এটি মানুষের যে কোনো কথা বুঝতে পারে, যে কোনো জিনিস শিখিয়ে দিলে এটি শিখে নিতে পারে। শুধু যে নানা ধরনের জিনিস চিনিয়ে দেওয়া যায় তাই নয়; এটি পুরোপুরি মানবিক কিছু ব্যাপারও বুঝতে পারে, ভালো, খারাপ বা আনন্দ এবং দুঃখ এই ধরনের ব্যাপার নিয়েও তার বেশ স্পষ্ট ধারণা আছে। নীলা যখন টুইটিকে একটা ছোট বাচ্চার নানা ধরনের কর্মকাণ্ড নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প বলল, আবিদ হাসান অবাক হয়ে দেখলেন টুইটি গল্পটা সত্যি সত্যি একজন মানবশিশুর মতো উপভোগ করল। এটি একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার এবং আবিদ হাসান নিজের চোখে না দেখলে এটি তিনি বিশ্বাস করতেন না।

সেদিন গভীর রাতে আবিদ হাসান ইন্টারনেটে কুকুরের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য নিজের কম্পিউটারে ডাউনলোড করে নিয়ে এলেন। মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় চোখ বুলিয়ে পশুপাখির বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য নিয়ে পড়াশোনা করলেন। রাতে ঠিক ঘুমানোর আগে তিনি ডক্টর আসিফ আহমেদ আজহারের পেটেন্টটি একবার দেখার চেষ্টা করে একটি বিচিত্র জিনিস আবিষ্কার করলেন। তাঁর একাধিক পেটেন্ট রয়েছে সত্যি কিন্তু সেগুলো কুকুরের বুদ্ধিমত্তার জিন্সকে আলাদা করার ওপরে নয়। তার পেটেন্টগুলো হচ্ছে একটি প্রাণীর দেহে ভিন্ন প্রজাতির একটি প্রাণীর কোষকে অনুপ্রবেশ করিয়ে সেখানে সেটিকে বাঁচিয়ে রাখার উপরে।

সে রাতে আবিদ হাসান অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাতে পারলেন না। ঠিক কী তাকে পীড়া দিচ্ছিল তিনি বুঝতে পারলেন না কিন্তু টুইটির পুরো ব্যাপারটি নিয়ে তার ভিতরে এক ধরনের অশান্তি কাজ করতে লাগল। তার কেন জানি মনে হতে লাগল এখানে কোনো এক ধরনের অশুভ ষড়যন্ত্র চলছে।

৪

সকালে নাশতা খেতে খেতে আবিদ হাসান অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলেন। মুনিরা হাসান তার স্বামীকে ভালোই বুঝতে পারেন, খানিকক্ষণ চোখের কোনা দিয়ে তাকে লক্ষ করে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী হয়েছে? কী নিয়ে এত চিন্তা করছ?"

"টুইটিকে নিয়ে।"

"কী চিন্তা করছ?"

আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "তুমি তো দেখেছ টুইটির কী সাংঘাতিক বুদ্ধি!"

"হ্যাঁ। দেখেছি।"

"কিন্তু একটা কুকুরের এই ধরনের বুদ্ধি থাকা সম্ভব না। নিচু শ্রেণীর ম্যামেলের বুদ্ধির বেশিরভাগ হচ্ছে সহজাত বুদ্ধি বা ইন্সটিংক্ট। কিন্তু টুইটির বুদ্ধি অন্যরকম—সে শিখতে পারে এবং সেটা কাজে লাগাতে পারে। এই রকম বুদ্ধি শুধু মানুষেরই থাকতে পারে।"

মুনিরা হাসান হাসলেন, বললেন, "আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি টুইটি মানুষ না।"

"সেটাই তো সমস্যা। হিসাব মিলাতে পারছি না। পেট ওয়ার্ডের পুরো ব্যাপারটা নিয়েই আমার ভিতরে এক ধরনের অস্বস্তি হচ্ছে। কেমন জানি অশান্তি হচ্ছে, মনে হচ্ছে কিছু একটা বড় রকমের অন্যায় হচ্ছে।"

মুনিরা হাসান হেসে বললেন, "এই দেশে মানুষজনের জীবনেরই ঠিক নেই, কুকুরকে নিয়ে অন্যায় হলে আর কত বড় অন্যায় হবে? অন্তত পক্ষে এইটুকু তো বলতে পারবে টুইটি মহাসুখে আছে!"

"তা ঠিক" আবিদ হাসান আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

কাজে বের হয়ে যাবার সময় আবিদ হাসান টুইটির ঘরের পাশে একবার দাঁড়ালেন, তাকে দেখে টুইটি তার কাছে ছুটে এল, তাকে ঘিরে ছোট ছোট লাফ দিয়ে টুইটি আনন্দ প্রকাশ করার চেষ্টা করতে লাগল। আবিদ হাসান নরম গলায় বললেন, "কী রে টুইটি, তুই ভালো আছিস?"

টুইটি মাথা নাড়ল, আবিদ হাসানের স্পষ্ট মনে হল টুইটি তার প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছে। তিনি নিজের ভিতরে টুইটির জন্য এক ধরনের স্নেহ অনুভব করলেন। কুকুর ছানাটিকে তিনি নিজের কাছে টেনে আনলেন, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে নরম গলায় কিছু কথা বললেন। ধবধবে সাদা লোমের ভিতর আঙুল প্রবেশ করিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে হঠাৎ মনে হল তিনি কিছু একটা স্পর্শ করেছেন। আবিদ হাসান কৌতূহলী হয়ে টুইটির মাথার লোম সরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, সেখানে একটি অস্ত্রোপচারের চিহ্ন। ছোটখাটো অস্ত্রোপচার নয়, বিশাল একটি অস্ত্রোপচার, মনে হয় পুরো খুলিটিই কেটে আলাদা করা হয়েছিল।

আবিদ হাসান হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন, তার হঠাৎ একটি নতুন জিনিস মনে হয়েছে। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে নয়—অন্য কোনোভাবে টুইটির বুদ্ধিমত্তা বাড়ানো হয়েছে!

আবিদ হাসান অফিসে গিয়ে কাজে খুব একটা মন দিতে পারলেন না। সারাক্ষণ তার ভিতরে কিছু একটা খুঁতখুঁত করতে থাকল। দুপুরবেলা তিনি পেট ওয়ার্ডে ফোন করলেন, মিষ্টি গলার একটি মেয়ে তার টেলিফোনের উত্তর দিল। আবিদ হাসান জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি জেরিন?"

"হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?"

"আমার নাম আবিদ হাসান।"

জেরিন তাকে চিনতে পারল, খুশি হয়ে বলল, "আমাদের টেস্ট কেস কেমন আছে আপনার বাসায়?"

"ভালো আছে।"

"চমৎকার। আমাদের স্টাফ নিয়মিত যাচ্ছে নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ যাচ্ছে। খুব যত্ন করছে, কোনো সমস্যাই নেই।"

"খুব ভালো লাগল শুনে, তা এখন আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?"

আবিদ হাসান একটু ইতস্তত করে বললেন, "আপনাদের যে কুকুর ছানাটি আমাদের বাসায় আছে সেটি নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন ছিল।"

"বেশ। আপনাকে আমি সার্ভিস সেন্টারে কানেকশান দিয়ে দিচ্ছি—"

"না, না। সার্ভিস সেন্টার নয়, আমি আসলে ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলতে চাই। উঁচু ম্যানেজমেন্ট। খুব জরুরি একটা ব্যাপারে।"

জেরিন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "ম্যানেজমেন্টের সবাই তো এখন ব্যস্ত, একটা বোর্ড মিটিঙে আছেন।"

"আমার ব্যাপারটি আসলে বোর্ড মিটিঙের মতোই জরুরি।" আবিদ হাসান ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "ডক্টর আজহারকে বলেন যে আপনাদের কুকুরের মাথায় অস্ত্রোপচারের একটা ব্যাপার নিয়ে আমি কথা বলতে চাই।"

জেরিন বলল, "বেশ। আপনি এক মিনিট অপেক্ষা করুন।"

আবিদ হাসান টেলিফোনে বিদেশী গান শুনতে শুনতে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দীর্ঘ সময় পর টেলিফোনে খুট করে শব্দ হল এবং সাথে সাথে ডক্টর আজহারের গলা শুনতে পেলেন, "গুড মর্নিং মিস্টার হাসান।"

"গুড মর্নিং।"

আজহার বলল, "আপনি কি একটা জরুরি ব্যাপার নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে চান?"

"হ্যাঁ।" আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "আমি ঠিক কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। আপনার সাথে আমি যখন কথা বলেছি তখন আপনি বলেছিলেন জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে আপনারা কুকুরের বুদ্ধিমত্তা বাড়িয়েছেন।"

"বলেছিলাম। সেটি নিয়ে কোনো সমস্যা হয়েছে?"

"ঠিক সমস্যা নয়, কনফিউশান হয়েছে। আপনাদের কুকুর ছানাটির ইন্টেলিজেন্স আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। সোজা কথায় এটি অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান। আমি পশুপাখির বুদ্ধিমত্তা নিয়ে পড়াশোনা করে দেখেছি, আপনাদের কুকুর ছানার বুদ্ধিমত্তা ম্যামেলের মাঝে থাকা সম্ভব নয়।"

টেলিফোনের অন্যপাশে ডক্টর আজহার উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, "ম্যামেল বলতে যা বোঝায় আমাদের টেস্ট-কেস তা নয়। আপনাকে তো আমরা বলেছি জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী তৈরি করেছি।"

"তা হলে কুকুরটার মাথায় অপারেশনের চিহ্ন কেন?"

"অপারেশন?"

"হ্যাঁ।"

ডক্টর আজহার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার লক্ষ করেছেন মি. হাসান। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে যে বুদ্ধিমান প্রজাতি আমরা দাঁড় করিয়েছি তার মস্তিষ্কের সাইজ অনেক বড়। সাধারণ কুকুরের স্কালে সেটা গ্রো করতে পারে না। তাই সার্জারি করে স্কালের সাইজটি বড় করতে হয়।"

"এটি কি পশু নির্যাতনের মাঝে পড়ে না?"

ডক্টর আজহার আবার হো হো করে হেসে বলল, "এই দেশে মানুষ নির্যাতনের জন্যই আইন ঠিক করা হয় নি, পশু নির্যাতনের আইন করবে কে?"

আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "এই জন্যই কি আপনারা পেট ওয়ার্ড

তৈরি করার জন্য আমাদের দেশকে বেছে নিয়েছেন?"

"না। এই জন্য করি নি। গবেষণার জন্য পশুপাখি ব্যবহার করা নতুন কিছু নয়। আমাদের মডার্ন মেডিসিন পুরোটাই তৈরি হয়েছে পশুপাখির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। মানুষের জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনি যদি ভেজিটারিয়ান না হয়ে থাকেন তা হলে আপনি নিশ্চয়ই গরু ছাগল হাঁস মুরগিও খান।"

আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস ফেললেন, কোনো কথা বললেন না। ডক্টর আজহার বলল, "আপনার সব কনফিউশান কি দূর হয়েছে হাসান সাহেব?"

"হ্যাঁ। হয়েছে। শুধু একটা ব্যাপার। ছোট একটা ব্যাপার।"

"কী ব্যাপার?"

"আপনি বলেছিলেন জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে বুদ্ধিমান কুকুর তৈরি করা সম্পর্কে আপনার একটা পেটেন্ট আছে।"

ডক্টর আজহার এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "হ্যাঁ। কোনো সমস্যা?"

"হ্যাঁ। ছোট একটা সমস্যা। আমি ইন্টারনেটে আপনার পেটেন্টগুলো পরীক্ষা করে দেখছিলাম। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙে আপনার কোনো পেটেন্ট নেই।"

ডক্টর আজহার দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, "আপনি—আপনি আমার পেটেন্টের খোঁজ নিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। ইন্টারনেটের কারণে ঘরে বসে নেওয়া যায়। ব্যান্ড উইডথ বেশি নয় বলে সময় একটু বেশি লাগে। আপনার পেটেন্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে। এক প্রজাতির প্রাণীর ভিতরে অন্য প্রজাতির প্রাণীর টিস্যু বসিয়ে দেওয়ার উপরে।"

ডক্টর আজহার চুপ করে রইল। আবিদ হাসান বললেন, "আপনি আমার কাছে একটা মিথ্যা কথা বলেছেন। কেন বলেছেন জানি না। যে একটা মিথ্যা কথা বলতে পারে সে অসংখ্য মিথ্যা কথা বলতে পারে। কাজেই আমি আপনার কোন কথাটা বিশ্বাস করব বুঝতে পারছি না।"

ডক্টর আজহার শীতল গলায় বলল, "আপনি আমার কোন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছেন না?"

"আমার ধারণা, আপনারা আসলে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে বুদ্ধিমান কুকুর তৈরি করেন নি। আপনারা খুব সাধারণ একটা কুকুরের মাথায়—"

"কুকুরের মাথায়?"

"সাধারণ একটা কুকুরের মাথায় মানুষের মস্তিষ্ক লাগিয়ে দিয়েছেন। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙে আপনার কোনো দক্ষতা নেই—কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার দক্ষতা আছে।"

ডক্টর আজহার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসতে শুরু করল, আবিদ হাসান টেলিফোনটা রেখে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

দুপুরবেলা একটা খুব জরুরি মিটিং ছিল কিন্তু আবিদ হাসান দুপুরের আগেই বের হয়ে এলেন। মিটিঙে তাকে না দেখে তার প্রজেক্টের সবাই চেঁচামেচি শুরু করবে কিন্তু তার কিছু করার নেই। পেট ওয়ার্ড সম্পর্কে তার ভিতরে যে সন্দেহটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। টুইটিকে নিয়ে তার মাথার এক্স-রে করিয়ে নিতে হবে। তাকে মাঝে মাঝেই নানারকম ওষুধ খাওয়ানো হয় সেগুলো ঠিক কী ধরনের ওষুধ সেটাও বিশ্লেষণ করতে হবে। টুইটির মস্তিষ্কের খানিকটা টিস্যু কোনোভাবে বের করা যায় কি না সেটা নিয়েও তার পরিচিত একজন নিউরো সার্জনের সাথে কথা বলতে হবে। পেট ওয়ার্ডকে

যদি আইনের আওতায় আনতে হয় তা হলে পুলিশকেও জানাতে হবে। এ দেশের পুলিশ তার কোনো কথা বিশ্বাস করবে কি না সে ব্যাপারে অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আবিদ হাসান পার্কিং লট থেকে তার গাড়িটা বের করে রাস্তায় ওঠার সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মাইক্রোবাস তার পিছু পিছু যেতে শুরু করল, সেটা তিনি দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেও সেটি যে তাঁর পিছু নিয়েছে সেটাও বোঝার তার কোনো উপায় ছিল না।

সেগুন বাগানে আবিদ হাসানের বাসার রাস্তাটুকু তুলনামূলকভাবে নির্জন, সেখানে ঢোকার পর হঠাৎ করে আবিদ হাসানের মনে পিছনের মাইক্রোবাসটি নিয়ে একটু সন্দেহ হল, রিয়ার ভিউ মিররে অনেকক্ষণ থেকে সেটাকে তিনি তাঁর পিছনে দেখতে পাচ্ছিলেন। ঢাকার রাস্তায় একই গাড়ি প্রায় আধঘণ্টা সময় ঠিক পিছনে পিছনে আসার সম্ভাবনা খুব কম। পিছনের মাইক্রোবাসটি কাদের এবং ঠিক কেন তার পিছু পিছু আসছে সে সম্পর্কে আবিদ হাসানের কোনো ধারণাই ছিল না। এটি সত্যি সত্যি তার পিছু আসছে নাকি ঘটনাক্রমে তার পিছনে রয়েছে সেটা পরীক্ষা করার জন্য আবিদ হাসান একটা সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন, খানিকদূর গিয়ে যখন দেখতে পেলেন সামনে কোনো গাড়ি নেই তখন একেবারে হঠাৎ করে তিনি গাড়িটি রাস্তার মাঝখানে ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টোদিকে যেতে শুরু করলেন। খানিকদূর গিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখলেন মাইক্রোবাসটিও রাস্তার মাঝে ইউ-টার্ন নেওয়ার চেষ্টা করছে—সেটি যে তার পিছু পিছু আসছে সে ব্যাপারে এবারে তার কোনো সন্দেহ রইল না। আবিদ হাসান ঠিক কী করবেন বুঝতে পারলেন না। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম, সামনে বড় রাস্তায় অনেক ভিড়, রিয়ার ভিউ মিররে তাকিয়ে অবস্থাটা আঁচ করার চেষ্টা করছিলেন তার আগেই হঠাৎ করে মাইক্রোবাসটা গুলির মতো ছুটে এসে তাকে ওভারটেক করে রাস্তার মাঝে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে গেল। আবিদ হাসান ব্রেক কষে গাড়ি থামালেন, তিনি অবাক হয়ে দেখলেন মাইক্রোবাস থেকে কালো পোশাক পরা দুজন মানুষ নেমে এসেছে, দুজনের হাতেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র!

আবিদ হাসানের সমস্ত শরীর আতঙ্কে অবশ হয়ে গেল, তার মাঝে কোনো একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সচল রাখার চেষ্টা করে। কোনো কিছু না বুঝে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার সহজাত এবং আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি গাড়ি ব্যাক গিয়ারে নিয়ে এক্সেলেটরে সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিলেন। টায়ার পোড়া গন্ধ ছুটিয়ে গাড়িটা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পিছনে ছুটে গেল, কোথাও ধাক্কা লেগে প্রচণ্ড শব্দ করে কিছু একটা ভেঙেচুরে গুঁড়ো করে ফেলল, জিনিসটি কী আবিদ হাসান বুঝতে পারলেন না এবং বোঝার চেষ্টাও করলেন না।

ঠিক এ রকম সময়ে মানুষ দুজন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে তার দিকে লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করে, আবিদ হাসান মাথা নিচু করে আবার এক্সেলেটরে চাপ দিতেই গাড়িটি জীবন্ত প্রাণীর মতো পিছনে ছিটকে গেল। ঝনঝন শব্দ করে গাড়ির কাচ ভেঙে পড়ল এবং তার মাথার উপর দিয়ে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে বুলেট ছুটে গেল। আবিদ হাসান সম্পূর্ণ আন্দাজের ওপর ভর করে গাড়িটা ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। বৃষ্টির মতো গুলি ছুটে এল, গাড়ির বনেটে প্রবল ধাতব শব্দ শোনা যেতে থাকে এবং সেই অবস্থায় গাড়িটা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ঘুরে যায়, পাগলের মতো স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে কোনোমতে গাড়িটার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে চেষ্টা করলেন আবিদ হাসান। পুরোপুরি আন্দাজের ওপর নির্ভর করে গাড়িটা রাস্তায় তোলার চেষ্টা করলেন, আবার কোথাও ধাক্কা লেগে গাড়িটা লাফিয়ে কয়েক ফুট উপরে উঠে গেল। প্রচণ্ড শব্দে সেটা নিচে আছড়ে পড়ল এবং আবিদ হাসান তখন একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনলেন। গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে করতে মাথা তুলে পিছনে

তাকিয়ে দেখতে পেলেন কালো পোশাক পরা মানুষ দুজন নিজেদের মাইক্রোবাসের দিকে ছুটে যাচ্ছে, গুলির শব্দ শুনে লোকজন ছোটাছুটি করে পালিয়ে যাচ্ছে। আবিদ হাসান বুক থেকে আটকে থাকা একটা নিশ্বাস বের করে গাড়িতে সোজা হয়ে বসে রাস্তায় নেমে এলেন। গাড়িটা চালাতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন সেটি নড়তে চাইছে না, শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে পিছনে কোনো একটি চাকার বাতাস বের হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় গাড়িটাকে আবিদ হাসান আরো কিলোমিটার খানেক চালিয়ে নিয়ে রাস্তার পাশে থামালেন। ঘটনাস্থলে লোকজনের মাঝে ছোটাছুটি হইচই হচ্ছিল, এখানে কেউ কিছু জানে না। তাঁর ক্ষতবিক্ষত ভেঙেচুরে যাওয়া গাড়িটাও কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। ইঞ্জিন বন্ধ করে আবিদ হাসান নিজের দিকে তাকালেন, কপালের কাছে কোথাও কেটে গিয়ে রক্ত বের হচ্ছে, ডান হাতের কনুইয়ে প্রচণ্ড ব্যথা, তিনি হাতটা সাবধানে এক-দুইবার নেড়ে দেখলেন, কোথাও ভাঙে নি। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের রক্তটা মুছে সাবধানে গাড়ি থেকে বের হলেন—তার অনেক সুখের গাড়ি একেবারে ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেছে। অসংখ্য গুলিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, এটি একটি বিস্ময়ের ব্যাপার যে তার শরীরে গুলি লাগে নি। দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন বলে গাড়িতে উঠলেই সিটবেল্ট বাঁধার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তাই কোনো গুরুতর জখম হয় নি। আবিদ হাসান গাড়ির দরজা বন্ধ করার সময় লক্ষ করলেন তাঁর হাত অল্প অল্প কাঁপছে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করলেন হঠাৎ করে তার মস্তিষ্ক আশ্চর্য রকম শীতল হয়ে গেছে তার ভিতরে কোনো উত্তেজনা নেই। কী করতে হবে সে সম্পর্কে তার খুব স্পষ্ট ধারণা আছে।

প্রথমেই তিনি দেখলেন তার পকেটে মানিব্যাগ এবং সেই মানিব্যাগে কোনো টাকা আছে কি না। তারপর একটু হেঁটে প্রথমেই যে স্কুটার পেলেন সেটাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সেটি মতিঝিল যাবে কি না। স্কুটারটি রাজি হওয়া মাত্র তিনি সেটাতে উঠে বসে গেলেন। স্কুটারটি ছুটে চলতেই আবিদ হাসান পিছনে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না, যখন নিঃসন্দেহ হলেন কেউ তার পিছু পিছু আসছে না তখন তিনি স্কুটারটি থামিয়ে নেমে পড়লেন। তাড়া চুকিয়ে তিনি ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকান খুঁজে বের করলেন। ভিতরে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ একটা ফোন সামনে নিয়ে উদাস হয়ে বসে ছিল, তাকে দেখে সোজা হয়ে বসল। আবিদ হাসান তার স্ত্রীর টেলিফোন নম্বরটি দিলেন, ডায়াল করে মানুষটি টেলিফোনটি আবিদ হাসানের দিকে এগিয়ে দেয়। অন্যপাশে তাঁর স্ত্রীর গলার আওয়াজ পেয়ে আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "মুনিরা—"

"হ্যাঁ, আবিদ। কী ব্যাপার?"

"কী ব্যাপার তুমি এখন জানতে চেয়ো না। আমি তোমাকে যা বলব তাই তোমাকে করতে হবে। বুঝেছ?"

আবিদ হাসানের গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যে মুনিরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ভয়-পাওয়া-গলায় বললেন, "কী হয়েছে?"

"অনেক কিছু। তোমাকে পরে বলব। তোমাকে এই মুহূর্তে নীলাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তুমি নিজে যেতে পারবে না। বুঝেছ?"

"বুঝেছি। কিন্তু নিজে যেতে পারব না কেন?"

আবিদ হাসান শান্ত গলায় বললেন, "তোমাকে পরে বলব। নীলাকে স্কুল থেকে এনে তোমরা দুজন হোটেল সোনারগাঁওয়ে চলে যাবে। সেখানে একটা রুম ভাড়া করবে। রুম ভাড়া করবে জাহানারা বেগমের নামে—"

"জাহানারা বেগম? জাহানারা বেগম কে?"

"আমার মা। তুমি জান।"

"হ্যাঁ সেটা তো জানি, কিন্তু তার নামে কেন?"

"তা হলে আমার নামটা মনে থাকবে, তোমার সাথে আমি যোগাযোগ করতে পারব। সেজন্যে—"

মুনিরা হাসান কাঁপা গলায় বললেন, "কী হচ্ছে আবিদ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছ কেন?"

"আমি তোমাকে সব বলব। শুধু জেনে রাখ আমি তোমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছি না। শুনে রাখ, তুমি কিছুতেই নীলাকে নিয়ে বাসায় যাবে না। কিছুতেই যাবে না। মনে থাকবে?"

"থাকবে।"

"হোটেল থেকে তোমরা বাইরে কাউকে ফোন করবে না। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"তোমার কাছে টাকা না থাকলে টাকা ম্যানেজ করে নাও। আর এই মুহূর্তে নীলাকে আনার ব্যবস্থা কর।"

মুনিরা হাসান টেলিফোনে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ভাঙা গলায় বললেন, "তুমি কোথা থেকে কথা বলছ?"

আবিদ হাসান একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "সেটা তোমার শুনে কাজ নেই। যখন সময় হবে জানাব। আমি রাখছি। জেনে রাখ আমি ভালো আছি।"

মুনিরা আরো কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু আবিদ হাসান তার আগেই টেলিফোনটা রেখে দিলেন, তার হাতে সময় খুব বেশি নেই। টেলিফোনের বিল দিয়ে আবিদ হাসান বের হয়ে এলেন। তাকে যে পেট ওয়ার্ডের লোকেরা মেরে ফেলতে চেয়েছে সে ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই। যার অর্থ টুইটির ব্যাপারে তার ধারণাটি সত্যি। টুইটি সাধারণ কোনো কুকুর নয়, এর মস্তিষ্কটি মানুষের মস্তিষ্ক দিয়ে পাল্টে দেওয়া হয়েছে। মানুষের মস্তিষ্কের আকার অনেক বড়, কুকুরের মাথায় সেটি আটানো সম্ভব নয়, কাজেই সম্ভবত পুরোটুকু নেওয়া হয় না। কিংবা কে জানে হয়তো মস্তিষ্কের টিস্যু লাগিয়ে দেওয়া হয়, যেন কুকুরটির মাঝে খানিকটা কুকুর এবং খানিকটা মানুষের বুদ্ধিমত্তা চলে আসে। আবিদ হাসানের হঠাৎ করে পেট ওয়ার্ডের সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা মনে পড়ল। কে জানে হয়তো সেখানে সেবা দেওয়ার নাম করে হতদরিদ্র মহিলাদের সন্তানদের নিয়ে নেওয়া হয়। পুরো ব্যাপারটাই একটি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করার পুরো দায়িত্বটিই এখন আবিদ হাসানের—সেটি প্রকাশ করতে হলে সবচেয়ে প্রথম দরকার টুইটিকে। সবচেয়ে বড় প্রমাণই হচ্ছে টুইটি। কাজেই এখন তার টুইটিকে উদ্ধার করতে হবে। হাতে সময় নেই, টুইটিকে নিয়ে আসার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বাসায় ফিরে যেতে হবে।

আবিদ হাসান রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে একটা খালি স্কুটারকে থামালেন। স্কুটারে করে তিনি তার বাসার সামনে দিয়ে গিয়ে আবার ঘুরে এলেন। আশপাশে সন্দেহজনক কেউ দাঁড়িয়ে নেই। বাসার পিছনে একটি গেট রয়েছে যেটি কখনোই ব্যবহার হয় না, আবিদ হাসান তার কাছাকাছি এসে স্কুটার থেকে নেমে পড়লেন। স্কুটারটিকে দাঁড়া করিয়ে রেখে তিনি নেমে এলেন, পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলে ভিতরে ঢুকে তিনি চাপা গলায় ডাকলেন, "টুইটি।"

প্রায় সাথে সাথেই টুইটি গাছের আড়াল থেকে তার কাছে ছুটে এসে তাকে ঘিরে আনন্দে লাফাতে শুরু করল। আবিদ হাসান দুই হাতে কুকুরটাকে তুলে নিয়ে নিচু গলায় বললেন, "টুইটি সোনা, চল এখান থেকে পালাই, এখন আমাদের খুব বিপদ।"

টুইটি কী বুঝল কে জানে কয়েকবার মাথা নেড়ে একটা চাপা শব্দ করল। স্কুটারে উঠে আবিদ হাসান বললেন, "রমনা থানায় চল।"

স্কুটার চলতে শুরু করতেই আবিদ হাসান চারদিকে তাকাতে লাগলেন, কেউ তার পিছু পিছু আসছে কি না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। চারপাশে অসংখ্য গাড়ি রিকশা স্কুটার ছুটে চলছে, তার মাঝে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। আবিদ হাসান একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, কোনোভাবে থানার মাঝে ঢুকে পড়তে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

থানার সামনে টুইটিকে নিয়ে নেমে আবিদ হাসান স্কুটারের ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। তার হাতে কুকুরটি দেখে কয়েকজন পথচারী কৌতূহল নিয়ে তাকাল, একজন বলল, "কী সুন্দর কুকুর!"

"হ্যাঁ।" আবিদ হাসান মাথা নাড়লেন, "খুব সুন্দর।"

"বিদেশী কুকুর নাকি?"

"হ্যাঁ। এটার নাম আইরিশ টেরিয়ার।"

"একটু হাত দিয়ে দেখি? কামড় দেবে না তো?"

"না কামড় দেবে না। খুব শান্ত কুকুর।"

মানুষটি টুইটির মাথায় হাত বুলানোর জন্য এগিয়ে এল। ঠিক তখন আবিদ হাসান তার পিঠে একটা শক্ত ধাতব স্পর্শ অনুভব করলেন। শুনতে পেলেন কেউ তার কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে ইংরেজিতে বলছে, "আমি একজন পেশাদার খুনি। তুমি একটু নড়লেই খুন হয়ে যাবে।"

আবিদ হাসান হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মানুষটি আরো কাছে এসে বলল, "তোমার আর কোনো কিছু করার সুযোগ নেই, আমার কথা বিশ্বাস না করলে চেষ্টা করে দেখতে পার।"

আবিদ হাসান চেষ্টা করলেন না। যে মানুষটি টুইটির মাথায় হাত বুলিয়েছে সে কিছু একটা বলছে কিন্তু তিনি এখন কিছু বুঝতে পারছেন না। তার কানের কাছে মুখ রেখে মানুষটি ফিসফিস করে বলল, "আমি মনে মনে দশ পর্যন্ত গুনব, তার মাঝে তুমি সামনের গাড়িটাতে ওঠ। তুমি ইচ্ছা করলে নাও উঠতে পার—সত্যি কথা বলতে কী, আমি চাই তুমি না ওঠ। তা হলে তোমাকে আমি খুন করতে পারি। আমার জন্য সেটা খুব কম ঝামেলার।"

আবিদ হাসান নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। শুনতে পেলেন টুইটি একটা চাপা শব্দ করল। যে মানুষটি কুকুরের মাথায় হাত বুলিয়েছে সে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। আরো দু-একজন মানুষ সুন্দর কুকুরটি দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছে। তার মাঝে পিছনের মানুষটি হাতের অস্ত্রটি দিয়ে আবিদ হাসানকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "আমি যেখানে রিভলবারটি ধরেছি সেখানে তোমার হৃৎপিণ্ড। কাজেই কী করবে ঠিক করে নাও।"

আবিদ হাসানের হাত কাঁপতে থাকে, মনে হতে থাকে তিনি হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবেন। কিন্তু তিনি পড়ে গেলেন না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে আটকে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার দেশ কোথায়?"

পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দ করে বলল, "সামাজিক কথাবার্তা বলার জন্য তুমি সময়টা ভালো বেছে নাও নি। আমি গুনতে শুরু করছি। এক।"

আবিদ হাসানের মস্তিষ্ক হঠাৎ করে শীতল হয়ে আসে, পুরো পরিস্থিতিটুকু হঠাৎ করে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে এল। পিছনের মানুষটির ইংরেজি উচ্চারণ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের। মানুষটি পেশাদার খুনি এবং সম্ভবত তাকে এখনই মেরে ফেলবে। আবিদ হাসান বুঝতে পারলেন এই মানুষটির কথা শোনা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। তিনি একটা নিশ্বাস ফেললেন এবং পাঁচ পর্যন্ত গোনার আগেই টুইটিকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে গাড়িতে উঠে বসলেন। পিছনের মানুষটি হেঁটে হেঁটে তার পাশে এসে বসল, আবিদ হাসান কৌতূহল নিয়ে মানুষটার দিকে তাকালেন। মানুষটি সুদর্শন, বাঙালির মতো হলেও বাঙালি নয়, মানুষটি সম্ভবত মেক্সিকান।

ড্রাইভার গাড়িটা ছেড়ে দিল। পাশে বসে থাকা মেক্সিকান মানুষটি একটি বড় রিভলবার তার কোলের উপর রেখে হাত বাড়িয়ে টুইটির মাথায় হাত বুলিয়ে ইংরেজিতে বলল, "এই কুকুরের জন্য আমাকে মানুষ মারতে হবে—এই কথাটা কে বিশ্বাস করবে বল?"

আবিদ হাসান মনে মনে বললেন, "কেউ না।"

৫

ডক্টর আজহার নরম গলায় বলল, "আমি খুবই দুঃখিত মিস্টার আবিদ হাসান আপনাকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্য।"

আবিদ হাসান স্থির চোখে ডক্টর আজহারের দিকে তাকালেন, লোকটির গলার স্বরে এক ধরনের আন্তরিকতা রয়েছে, অন্য যে কোনো সময় হলে তিনি হয়তো লোকটার কথা বিশ্বাস করতেন, কিন্তু এখন বিশ্বাস করার কোনো উপায় নেই। দুপুরবেলা দুজন মানুষ তাকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে খুন করার চেষ্টা করেছে, রমনা থানার সামনে থেকে একজন মেক্সিকান পেশাদার খুনি তাকে ধরে এনেছে। এই মুহূর্তে একটা লোহার প্ল্যাটফর্মের দুইপাশে তার দুই হাত রেখে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে। আবিদ হাসান মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, দুই হাত আটকে থাকায় নড়াচড়া করতে পারছেন না। ভয় বা আতঙ্ক নয়, আবিদ হাসান নিজের ভিতরে এক ধরনের তীব্র অপমানবোধ অনুভব করছেন।

ডক্টর আজহার টেবিলের পাশে একটা গদিআঁটা চেয়ারে বসে পা দুলিয়ে বলল, "আমার হিসাবে একটা ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে আমি আন্ডার এস্টিমেট করেছি। আপনার বুদ্ধিমত্তা সাধারণ মানুষ থেকে অনেক বেশি। এখন আপনাকে বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই, পেট ওয়ার্ড সম্পর্কে আপনার প্রত্যেকটা ধারণা সত্যি।"

ডক্টর আজহার মাথা ঘুরিয়ে টুইটির দিকে তাকাল, ঘরের এক কোনায় সেটি শান্ত হয়ে বসে আছে। তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "আপনি ঠিকই অনুমান করছেন, এই যে কুকুরটা দেখছেন এটি আসলে একটি মানুষ। কুকুরের শরীরে আটকে পড়ে থাকা মানুষ।"

আবিদ হাসান ভেবেছিলেন কোনো কথা বলবেন না কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের কাছে হার মানলেন, মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "একটা কুকুরের মস্তিষ্কের সাইজ টেনিস বলের মতো। মানুষের মস্তিষ্ক তো অনেক বড়।"

"হ্যাঁ।" ডক্টর আজহার মাথা নাড়ল। বলল, "সে জন্য আমরা মস্তিষ্ক ট্রান্সপ্লান্ট করি ফিটাস থেকে, ভ্রূণ থেকে।"

আবিদ হাসান শিউরে উঠলেন। কোনোমতে একটা নিশ্বাস বুক থেকে বের করে নিয়ে বললেন, "আপনাদের সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো ভাঁওতাবাজি।"

"বলতে পারেন। আমরা অবশ্য ছোটখাটো মেডিক্যাল হেল্প দিই। যখন একটা বাচ্চার ভ্রূণ দরকার হয় কোনো একটা প্রেগন্যান্ট মহিলা থেকে নিয়ে নিই। তারা অবশ্য জানে না, তাদেরকে বলা হয় কোনো কারণে মিস-ক্যারেজ হয়েছে। আমাদের ডাক্তারেরা মানের উল্টো বকাবকি করে অনিয়ম করার জন্য।" ডক্টর আজহার কথা শেষ করে হা হা করে হাসতে শুরু করল।

আবিদ হাসান স্থির চোখে ডক্টর আজহারের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার ভিতরে এ নিয়ে কখনো কোনো অপরাধবোধ জন্মায় না?"

"অপরাধবোধ?" ডক্টর আজহার আবার শব্দ করে হেসে উঠল, "নাগাসাকি আর হিরোশিমাতে যারা নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেছিল তাদের কি অপরাধবোধ হয়েছিল? আলেকজান্ডার দি গ্রেটের কি অপরাধবোধ হয়েছিল? হয় নি। হওয়ার কথা নয়। একটা বড় কিছু করার জন্য অনেক ছোট ত্যাগ করতে হয়। এই দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের দেশের কিছু মানুষের এই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। একদিন যখন আমাদের এই প্রজেক্ট দেশের অর্থনীতির ভিত তৈরি করে দেবে—"

আবিদ হাসান বাধা দিয়ে বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে। আমি আর শুনতে চাই না।"

ডক্টর আজহার প্রথমবার একটু রেগে উঠল, বলল, "কেন শুনতে চান না?"

"কারণ উন্মাদের প্রলাপ অন্য উন্মাদেরা শুনুক। আমার শোনার প্রয়োজন নেই।"

ডক্টর আজহার খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আবিদ হাসানের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা এগিয়ে এনে কঠিন গলায় বলল, "আমাদের এই প্রজেক্টে কত ডলার ইনভেস্ট করা হয়েছে আপনি জানেন?"

"না। আমার জানার প্রয়োজন নেই। ইচ্ছেও নেই।"

"তবু আপনাকে শুনতে হবে। সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার। আপনি জানেন বিলিয়ন ডলার মানে কত? এক হাজার মিলিয়ন হচ্ছে এক বিলিয়ন। আর মিলিয়ন কত জানেন? এক হাজার—"

"আমার জানার প্রয়োজন নেই।"

"আছে। কেন আছে জানেন?"

"কেন?"

"কারণ সারা পৃথিবীর মাঝে শুধু আপনাকে আমি এই তথ্য দিতে পারি। একটি প্রাণীর দেহে অন্য প্রাণীর টিস্যুকে বাঁচিয়ে রাখার টেকনিক আমরা দাঁড় করিয়েছি। এন্টি-রিজেকশান ড্রাগের পেটেন্ট আমাদের। এখানে ব্রেন-ট্রান্সপ্লান্টের অপারেশন করে রোবট সার্জন। সেই রোবট সার্জন দাঁড় করতে আমাদের কত খরচ হয়েছে জানেন? সেই সফটওয়্যার দাঁড় করতে আমাদের কত দিন লেগেছে জানেন?"

আবিদ হাসান মাথা নেড়ে বললেন, "আমি জানতে চাই না।"

ডক্টর আজহার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "জানতে হবে। কারণ শুধু আপনিই এটা জানতে পারবেন। শুধু আপনাকেই আমি বলতে পারব।"

আবিদ হাসান প্রথমবার এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করলেন, কেন শুধুমাত্র তাকে বলতে পারবে সেটি অনুমান করা খুব কঠিন নয়। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে মেরে ফেলা হবে বলে?"

"না। আমি অপচয় বিশ্বাস করি না। শুধু শুধু আপনাকে মেরে কী হবে?"

"তা হলে?"

"আপনাকে আমরা ব্যবহার করব।"

"ব্যবহার?"

"হ্যাঁ। আমাদের কাছে বিশাল একটা কুকুর এসেছে। গ্রেট ডেন। চমৎকার কুকুর, তার মস্তিষ্ক ট্রান্সপ্লান্ট করব আপনার মস্তিষ্ক নিয়ে। আপনার বিশাল মস্তিষ্কের পুরোটা নিতে পারব না—যেটুকু পারি সেটুকু নেব।" ডক্টর আজহার মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আইডিয়াটি কেমন?"

আবিদ হাসান অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ডক্টর আজহারের দিকে তাকিয়ে রইল, ডক্টর আজহার মাথা নেড়ে বলল, আপনার এত চমৎকার একটি মস্তিষ্ক সেটা অপচয় করা কি ঠিক হবে? কী বলেন?"

আবিদ হাসান দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, "তুমি জাহান্নামে যাও—দানব কোথাকার।"

ডক্টর আজহার জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বলল, "রাগ হচ্ছেন কেন মিস্টার আবিদ হাসান? আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই, আপনার স্মৃতির কতটুকু অবশিষ্ট থাকে।"

আবিদ হাসান চিৎকার করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন টুইটি একটা চাপা শব্দ করল, সামনের দুই পায়ের মাঝে মাথা চেপে রেখে থরথর করতে লাগল। দেখে মনে হল সারা শরীরে এক ধরনের খিচুনি শুরু হয়েছে। ডক্টর আজহার টুইটির কাছে এগিয়ে গেল, চোখের পাতা টেনে কিছু একটা দেখে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল, খানিকটা হতাশ ভঙ্গিতে বলল, "এখনো হল না। কুকুরটা তার মস্তিষ্ককে রিজেক্ট করতে শুরু করেছে। আমাদের এন্টি-রিজেকশান ড্রাগকে আরো নিখুঁত করতে হবে।"

ডক্টর আজহার পা দিয়ে টুইটিকে উল্টে দিয়ে লম্বা পা ফেলে টেবিলটার কাছে এগিয়ে এল। পকেট থেকে কাগজপত্র এবং চাবি টেবিলের ওপর রেখে অনেকটা আপন মনে বলল, "আপনি মন খারাপ করবেন না মিস্টার আবিদ হাসান। ঘুমের একটা ইনজেকশন দিয়ে দেব, আপনি কিছু বুঝতেও পারবেন না। আপনার ঘুমন্ত দেহ ট্রেতে তুলে দেব, ব্যাস আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই।"

আবিদ হাসান কোনো কথা বললেন না, হিংস্র চোখে ডক্টর আজহারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ডক্টর আজহার ঘর থেকে বের হতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন? আপনার সাথে কিন্তু আমার বেশ মিল রয়েছে। আমার প্রায় সমবয়সী, দেখতেও অনেকটা একরকম। আমাদের বুদ্ধিমত্তাও মনে হয় কাছাকাছি। কিন্তু আপনার ক্ষমতা আমার ধারে কাছে নয়। আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না টাকা দিয়ে কত কী করা যায়।"

ডক্টর আজহার তার গলায় ঝোলানো কার্ড দিয়ে দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আবিদ হাসান বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুক্ষণের মাঝেই তার মস্তিষ্ককে একটা বিশাল গ্রেট ডেনের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হবে। এটি কি সত্যিই ঘটছে নাকি এটা একটা দুঃস্বপ্ন? ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন?

আবিদ হাসান তাঁর হাতের দিকে তাকালেন, দুই হাতে হাতকড়া দিয়ে প্লাটফর্মের সাথে আটকে রাখা, কংক্রিটের দেয়াল, উপরে এয়ার কুলারের ভেন্ট, স্টিলের দরজা উপরে ইলেকট্রনিক নিরাপত্তাসূচক নম্বর, একটু দূরে টুইটির কুঁকড়ে থাকা শরীর সবকিছু একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো, কিন্তু সেটি দুঃস্বপ্ন নয়। আবিদ হাসান প্রাণপণ চেষ্টা করলেন নিজেকে শান্ত রাখার কিন্তু এবারে অনেক কষ্ট করেও নিজেকে শান্ত করতে পারলেন না। শুধু তার মনে হতে লাগল ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার করে ধাতব প্লাটফর্মটিতে মাথা কুটতে শুরু করবেন।

কুকুরের একটি চাপা শব্দ শুনে আবিদ হাসান মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন। টুইটি আবার উঠে বসেছে, দুই পায়ের মাঝখানে মাথা রেখে ভীত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আবিদ হাসান হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন, টুইটি কি তাকে সাহায্য করতে পারবে না?

আবিদ হাসান সোজা হয়ে বসে টুইটিকে ডাকলেন, "টুইটি।"

টুইটি মাথা তুলে আবিদ হাসানের দিকে তাকাল। আবিদ হাসান চাপা গলায় বললেন, "তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ?"

টুইটি কষ্ট করে তার মাথা নাড়ল, সে বুঝতে পারছে। আবিদ হাসান উত্তেজিত গলায় বললেন, "তা হলে তুমি আমাকে সাহায্য কর। ঠিক আছে?"

টুইটি ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে আবিদ হাসানের দিকে তাকাল।

"ভেরি গুড টুইটি। চমৎকার। তুমি টেবিলের উপর ওঠ। সেখান থেকে মুখে করে চাবিটা নিয়ে আসবে আমার কাছে। বুঝেছ?"

টুইটি না-সূচকভাবে মাথা নাড়ল, সে ঠিক বুঝতে পারছে না। আবিদ হাসান একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, "না বুঝলেও ক্ষতি নেই, আমি তোমাকে সাহায্য করব। যাও তুমি টেবিলের উপর ওঠ।"

টুইটি নিজেকে টেনে টেনে নিতে থাকে, প্রথমে চেয়ার তারপর সেখান থেকে কষ্ট করে টেবিলের উপর উঠল। আবিদ হাসান উত্তেজনা চেপে রেখে বললেন, "এখন ডান দিকে যাও।"

টুইটি অনিশ্চিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল তারপর ডানদিকে এগিয়ে গেল। আবিদ হাসান বললেন, "ঐ যে চকচকে জিনিসটা সেটা চাবি। মুখে তুলে নাও।"

টুইটি একটা কলম মুখে তুলে নিল। আবিদ হাসান মাথা নেড়ে বললেন, "না। না। এটা চাবি না, এটা কলম। চাবিটা আরো সামনে।"

টুইটি কলমটা রেখে প্রথমে একটা পেন্সিল, তারপর একটা নোট বই এবং সবশেষে চাবিটা তুলে নিল। আবিদ হাসান চাপা আনন্দের স্বরে বললেন, "ভেরি গুড টুইটি! ভেরি ভেরি গুড! এভাবে চাবিটা নিয়ে এস আমার কাছে।"

টুইটি চাবিটা মুখে নিয়ে টেবিল থেকে নেমে আবিদ হাসানের কাছে এগিয়ে এল। আবিদ হাসান চাবিটা হাতে নিয়ে হাতকড়াটা খোলার চেষ্টা করলেন। কোথায় চাবি দিয়ে খুলতে হয় বুঝতে একটু সময় লাগল, একবার বুঝে নেবার পর খুট করে হাতকড়াটা খুলে যায়। উত্তেজনায় আবিদ হাসানের বুক ঠক ঠক করতে থাকে, সত্যি সত্যি তিনি এখান থেকে বেঁচে যেতে পারবেন কি না তিনি এখনো জানেন না, কিন্তু একবার যে শেষ চেষ্টা করে দেখবেন সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আবিদ হাসান টুইটিকে বুকে চেপে ধরে একবার আদর করলেন, তারপর যেখানে শুয়ে ছিল সেখানে শুইয়ে রেখে বললেন, "তুমি এখান থেকে নড়বে না। ঠিক আছে?"

টুইটি মাথা নেড়ে আবার দুই পায়ের মাঝখানে মাথাটা রেখে চোখ বন্ধ করল। কুকুরটি মনে হয় আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকবে না।

আবিদ হাসান এবারে ঘরটা ঘুরে দেখলেন, একটা লোহার রড বা শক্ত কিছু খুঁজছিলেন, টেবিলের নিচে সেরকম একটা কিছু পেয়ে গেলেন। এটা দিয়ে জোরে মাথায় আঘাত করতে পারলে একজন মানুষকে ধরাশায়ী করা খুব কঠিন হবে না। আবিদ হাসান রডটা নিয়ে তার আগের জায়গায় ফিরে এলেন। হাতকড়াটা হাতের ওপর আলতো করে রেখে প্লাটফর্মের

কাছে বসে রইলেন। ডক্টর আজহার ফিরে এলে একবারও সন্দেহ করতে পারবে না যে তিনি আসলে এখন নিজেকে মুক্ত করে রেখেছেন।

ডক্টর আজহার ফিরে এল বেশ অনেকক্ষণ পর। তার গলায় ঝুলানো কার্ডটি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে বেশ সহৃদয় ভঙ্গিতে বলল, "মিস্টার আবিদ হাসান, একটু দেরি হয়ে গেল। কেন জানেন?"

আবিদ হাসান কোনো কথা বললেন না, ডক্টর আজহার সেটা নিয়ে কিছু মনে করল না, হাসি মুখে বলল, "এই পেট ওয়ার্ডে সব মিলিয়ে আমরা চার-পাঁচজন মানুষ প্রকৃত ব্যাপারটি জানি। অন্যেরা সবাই জানে এটি হাজ্রেড পার্সেন্ট খাঁটি বিজনেস! কাজেই যখনি বেআইনি কিছু করতে হয় পুরো দায়িত্বটি এসে পড়ে আমাদের ওপর! আমি ছাড়া অন্য সবাই আসলে সিকিউরিটির মানুষ নতুবা যন্ত্র! কাজেই সবকিছুই আমাকে করতে হয়। বুঝেছেন?"

ডক্টর আজহার টেবিলে একটা কাচের এম্পুল রেখে সেখানে একটা সিরিঞ্জ দিয়ে ওষুধ টেনে নিতে নিতে বলল, "আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে নিতে হবে, তারপর ঐ কনভেয়ার বেল্টে আপনাকে উপুড় করে শুইয়ে দিতে হবে। ব্যস, তারপর আমার দায়িত্ব শেষ। কাল সকালে আপনি যখন ঘুম থেকে উঠবেন আপনি আবিষ্কার করবেন যে আপনি একটা বিশাল কুকুরের দেহে আটকা পড়ে আছেন।" ডক্টর আজহার আনন্দে হা হা করে হেসে উঠল।

ডক্টর আজহার সিরিঞ্জটা নিয়ে খুব সহজ ভঙ্গিতে আবিদ হাসানের দিকে এগিয়ে এল। মানুষটি কোনো কিছু সন্দেহ করে নি। আবিদ হাসানের বুকের ভিতর ধক্‌ধক্ করে শব্দ করতে থাকে—তিনি একটি মাত্র সুযোগ পাবেন, সেই সুযোগটি কি তিনি ব্যবহার করতে পারবেন? জীবনে কখনো কোনো মানুষকে আঘাত করেন নি, কীভাবে কোথায় কখন আঘাত করতে হয় সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই। কোথায় জানি দেখেছিলেন মাথার পিছনে আঘাত করলে মানুষ অচেতন হয়ে পড়ে। তিনি কি পারবেন সেখানে আঘাত করতে? আবিদ হাসান নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকেন।

ডক্টর আজহার আরেকটু কাছে এগিয়ে এল, সিরিঞ্জটা উপরে তুলে সুচের দিকে তাকিয়েছে, এক মুহূর্তের জন্য তার ওপর থেকে চোখ সরিয়েছে, সাথে সাথে আবিদ হাসান হাত মুক্ত করে লোহার রডটা তুলে নিলেন। ডক্টর আজহার হতচকিত হয়ে আবিদ হাসানের দিকে তাকাল এবং কিছু বোঝার আগেই আবিদ হাসান তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ডক্টর আজহারের মাথায় আঘাত করলেন। আত্মরক্ষার জন্য ডক্টর আজহার মাথাটা সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু কোনো লাভ হল না, প্রচণ্ড আঘাতে আর্তচিৎকার করে সে নিচে পড়ে গেল।

আবিদ হাসান দুই হাতে রডটি ধরে আরো কাছে এগিয়ে গেলেন, ডক্টর আজহার ওঠার চেষ্টা করলে আবার আঘাত করবেন, কিন্তু মানুষটার ওঠার ক্ষমতা আছে বলে মনে হল না। হাত থেকে সিরিঞ্জটা ছিটকে পড়েছে, আবিদ হাসান সেটি তুলে নিয়ে আসেন। মানুষকে তিনি কখনো ইনজেকশান দেন নি কিন্তু সেটি নিয়ে এখন ভাবনা-চিন্তা করার সময় নেই। সিরিঞ্জের সুচটা আজহারের হাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ওষুধটা তার শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন, দেখতে দেখতে ডক্টর আজহার নেতিয়ে পড়ল।

আবিদ হাসান বুক থেকে একটা নিশ্বাস বের করে দিলেন, পরিকল্পনার প্রথম অংশটুকু চমৎকারভাবে কাজ করেছে। এখন দ্বিতীয় অংশটুকু—এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া। আবিদ হাসান ডক্টর আজহারের গলায় ঝোলানো ব্যাজটা খুলে নিলেন—এটা ব্যবহার করে এই ঘর থেকে বের হওয়া যাবে।

ব্যাজে এক ধরনের ম্যাগনেটিক কোডিং রয়েছে সেটার সাহায্যে নিশ্চয়ই সব দরজা খুলে এই বিল্ডিং থেকে বের হওয়া যাবে কিন্তু তবু তিনি কোনো ঝুঁকি নিলেন না। ডক্টর আজহারের জ্যাকেটটা খুলে নিজে পরে নিলেন। দুজনের শরীরের কাঠামো মোটামুটি একরকম, হঠাৎ দেখলে বুঝতে পারবে না। সময় নষ্ট করে লাভ নেই, যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বের হওয়া যায়।

টুইটির কাছে গিয়ে আবিষ্কার করলেন সেটি নিথর হয়ে পড়ে আছে, বেঁচে আছে কি নেই বোঝার উপায় নেই। একটা নিশ্বাস ফেলে মাথায় হাত বুলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, টুইটিকে বাঁচানোর ক্ষমতা তার নেই। সবচেয়ে বড় কথা টুইটির জন্যে বেঁচে না থাকাই সম্ভবত বেশি মানবিক। আবিদ হাসান টেবিলের পাশে একটা এটাচি কেস আবিষ্কার করলেন। সম্ভবত ডক্টর আজহারের। ভিতরে নানা ধরনের কাগজপত্র, আবিদ হাসান এটাচি কেসটি হাতে তুলে নিলেন—এখানকার কিছু প্রমাণ বাইরে নিয়ে যাওয়া দরকার।

দরজায় ব্যাজটি প্রবেশ করাতেই সেটি শব্দ করে খুলে গেল। বাইরে বড় করিডোর, উপরে পর্যবেক্ষণ ক্যামেরা পরীক্ষা করছে, আবিদ হাসান সহজ ভঙ্গি করে হেঁটে যেতে শুরু করলেন। করিডোরের শেষ মাথায় আরেকটি দরজা। সেখানে ব্যাজটি প্রবেশ করাতেই একটা কর্কশ শব্দ শোনা গেল এবং সাথে সাথে তিনি একজন মানুষের গলায় স্বর শুনতে পেলেন, মানুষটি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "ডক্টর ট্রিপল-এ তুমি চলে যাচ্ছ কেন?"

আবিদ হাসানের হৃৎপিণ্ড প্রায় থমকে দাঁড়াল, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলেন। ডক্টর আজহারের ব্যাজ ব্যবহার করে বের হয়ে যাচ্ছেন বলে তাকে ডক্টর আজহার ভাবছে। সম্ভবত এই মুহূর্তে তাকে দেখতেও পাচ্ছে। আবিদ হাসান যথাসম্ভব মাথা নিচু করে বললেন, "শরীর ভালো লাগছে না।"

"যে লোকটাকে ধরে এনেছি তার কী অবস্থা?"

"ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।"

"গুড। ট্রান্সপ্লান্টের জন্য রেডি?"

আবিদ হাসান কী বলবেন বুঝতে পারলেন না, অস্পষ্ট এক ধরনের শব্দ করলেন, "হুস।"

"কনভেয়ার বেল্টে তুলেছ?"

"না।"

"ঠিক আছে দুশ্চিন্তা কোরো না, আমরা তুলে নেব।"

"থ্যাংকস।"

আবিদ হাসান চলে যাচ্ছিলেন তখন আবার সিকিউরিটির মানুষটির গলায় স্বর শুনতে পারলেন, "ডক্টর ট্রিপল-এ—"

"হুঁ।"

"তোমার গলার স্বর একেবারে অন্যরকম শোনাচ্ছে।" আবিদ হাসান ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলেও কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখলেন, বললেন, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। কী ব্যাপার?"

"জানি না। হয়তো ফ্লু। দুপুর থেকেই গলাটা খুশখুশ করছে।"

"ও। যাও গিয়ে বিশ্রাম নাও।"

আবিদ হাসান বুকের ভিতর থেকে একটা নিশ্বাস বের করে সাবধানে হেঁটে যেতে শুরু করলেন। সামনে আরো একটা দরজা, ব্যাজ ব্যবহার করে সেটা খুলে বের হয়ে এলেন।

দরজার ওপরে ইংরেজিতে বড় বড় করে লেখা, "কঠোর নিরাপত্তা অঞ্চল। শুধুমাত্র অনুমোদিত মানুষের জন্য।"

সামনে একটা লিফট, লিফটের বোতাম স্পর্শ করতেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। আবিদ হাসান ভিতরে ঢুকলেন। পেট ওয়ার্ডের গোপন এলাকা থেকে তিনি বাইরে চলে এসেছেন। এখানকার মানুষজন সাধারণ মানুষ, এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের কিছু জানে না। আবিদ হাসান ডক্টর আজহারের ব্যাজটি পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন, সম্ভবত এই ব্যাজটির আর প্রয়োজন নেই।

নিচে দরজার কাছে বড় টেবিলে জেরিনকে বসে থাকতে দেখা গেল। আবিদ হাসানকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "আপনি?"

"হ্যাঁ।"

"কখন এলেন?"

"এসেছি দুপুরবেলা। ডক্টর আজহার নিয়ে এসেছেন।"

"ও। সবকিছু ঠিক আছে তো?"

আবিদ হাসান জেরিন নামের মেয়েটির চোখের দিকে তাকালেন, সেখানে কোনো ধরনের জটিলতা নেই, সপ্রশ্ন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। আবিদ হাসান তাকে বিশ্বাস করবেন বলে ঠিক করলেন। বললেন, "না, সবকিছু ঠিক নেই।"

মেয়েটি চমকে উঠে বলল, "কী হয়েছে?"

"আপনি যদি আমার সাথে আসেন আপনাকে বলতে পারি।"

"জেরিন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু এখন আমার ভিউটি—"

আবিদ হাসান বাধা দিয়ে বললেন, "আপনাকে আমি বলতে পারি আমি আপনাকে যে কথাটি বলব সেটি হবে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ভিউটি।"

জেরিন আবিদ হাসানের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল, তারপর বলল, "ঠিক আছে চলুন।"

দুই মিনিট পর জেরিনের গাড়িতে বসে আবিদ হাসান বের হয়ে এলেন, গাড়িটি রমনা থানার দিকে যেতে থাকে।

৬

ডক্টর আজহারের এটাচি কেসে যে কাগজপত্র ছিল সেটি থেকে শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে পেট ওয়ার্ডের ষড়যন্ত্রের কথা বোঝানো সম্ভব হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিতে আরো কয়েক মাস সময় লেগেছে। পুরো ব্যাপারটিতে অস্বাভাবিক গোপনীয়তা রাখা হয়েছে, খবরের কাগজে কিছু ছাপা হয় নি। তার সঠিক কারণটি আবিদ হাসানের জানা নেই, তাকে সরকারের একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল, তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

ঠিক কী কারণে টুইটি হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং কেন তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না সেই ব্যাপারটি নীলা অবশ্য কিছুতেই বুঝতে পারল না। বড় মানুষেরা মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অর্থহীন কাজ করে বসে থাকে ; এটাও সেরকম কিছু একটা কাজ—এভাবেই সে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করল। মাঝে মাঝেই তার টুইটির জন্য খুব মন খারাপ হয়ে যেত।

আবিদ হাসান ব্যাপারটি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। বছর দুয়েক পর হঠাৎ করে আবার সেটি মনে পড়ল পত্রিকায় সার্কাসের বিজ্ঞাপন দেখে। সার্কাসের পশুপাখির নানা ধরনের খেলাধুলার মাঝে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ "বুদ্ধিমান কুকুরের কলাকৌশল।" একটি গ্রেট ডেন কুকুর নাকি মানুষের মতো সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করতে পারে।

আবিদ হাসান তার মেয়েকে নিয়ে সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন। সত্যি সত্যি বিশাল একটি গ্রেট ডেন কুকুর সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করে দেখাল, ইংরেজি নির্দেশ পড়ে সেই নির্দেশ মোতাবেক কিছু কাজকর্ম করল। সার্কাস শেষ হলে আবিদ হাসান কুকুরটিকে দেখতে গিয়েছিলেন। বড় একটি লোহার খাঁচায় আটকে রাখা ছিল, আবিদ হাসানকে দেখে হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর খেপে গিয়ে সেটা খাঁচার মাঝে লাফ-ঝাঁপ দিতে শুরু করে। কুকুরের ট্রেইনার অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! এটি খুব শান্ত কুকুর, আপনাকে দেখে এভাবে খেপে গেল কেন?"

"আমি জানি না।"

"আপনি কি কিছু বলেছেন? এই ব্যাটা আবার মানুষের কথা বুঝতে পারে।"

"হ্যাঁ। বলেছি।"

"কী বলেছেন?"

"বলেছি, কী খবর 'ডক্টর ট্রিপল-এ'?"

কথাটি একটি রসিকতা মনে করে ট্রেইনারটি হা হা করে হাসতে শুরু করল।

দ্বিতীয় জীবন

কয়েসের পিঠে একটা লাথি দিয়ে ছায়ামূর্তিটি বলল "ওঠ। শালা বেজন্মা কোথাকার।" কয়েস উবু হয়ে অন্ধকার ঘরের কোনায় বসে ছিল। তার দুই হাত পিছনে শক্ত করে বাঁধা। কব্জিতে না বেঁধে কনুইয়ের কাছে বেঁধেছে। সস্তা নাইলনের দড়ি, চামড়া কেটে বসে যাচ্ছে। লাথি খেয়ে সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, মানুষের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হাত দুটোর খুব প্রয়োজন, হাত বাঁধা থাকায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনোমতে তাল সামলে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পিছন থেকে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ছায়ামূর্তিটি বলল, "চল।"

কয়েস শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

মানুষটি পিছন থেকে অত্যন্ত রূঢ় গলায় বলল, "তোর শ্বশুরবাড়িতে—হারামজাদা বাঞ্চত কোথাকার।"

কয়েস কোনো কথা না বলে অন্ধকারে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি আবার একটা ধাক্কা দিতেই সে হাঁটতে শুরু করে। বাইরে নির্জন অন্ধকার রাত। হেমন্তের হালকা কুয়াশা চারদিকে এক ধরনের অস্পষ্ট আবরণের মতো ঝুলে আছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত, অনেক দেরি করে চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নার নরম আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েস চোখ তুলে তাকাল—দৃশ্যটি সম্ভবত সুন্দর কিন্তু সেটা সে বুঝতে

পারছে না। সুন্দর জিনিস অনুভব করার জন্য যে রকম মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন সেটি তার নেই।

কয়েস হাঁটতে হাঁটতে পিছনের মানুষটিকে বলল, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

পিছনের মানুষটি বেঁকিয়ে উঠে বলল, "চুপ কর শালা। কথা বলবি না।"

"মাত্র একটা কথা।"

মানুষটি ধমক দিয়ে বলল, "চুপ।"

কয়েস চুপ করে শীতের হিম কুয়াশায় আরো কিছুক্ষণ হেঁটে যায়, তারপর প্রায় মরিয়া হয়ে আরো একবার কথা বলতে চেষ্টা করে, "ভাই, আপনাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করি? একটা কথা।"

পিছনের মানুষটা কোনো কথা বলল না। কয়েস আবার অনুনয় করে বলল, "করি?"

"কী কথা?"

"আমাকে কী করবেন?"

পিছনের মানুষটা কোনো কথা না বলে হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল। কয়েস আবার জিজ্ঞেস করল, "কী করবেন?"

"রং করিস আমার সাথে? শালা তুই বুঝিস নাই কী করব?"

কয়েস কোনো উত্তর দিল না, সে বুঝতে পারছে কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইছে না। নিজের কানে একবার শুনতে চাইছে। সে আরো কয়েক পা নিঃশব্দে হেঁটে গিয়ে বলল, "কী করবেন?"

মানুষটি হঠাৎ রেগে গেল, রেগে চাপা গলায় চিৎকার করে বলল, "শুনবি কী করব তোকে? শুনবি? শোন তা হলে। তোকে নিয়ে নদীর ঘাটে দাঁড় করিয়ে মাথার মাঝে একটা গুলি করব। বুঝেছিস?"

কয়েসের সারা শরীর অবশ হয়ে ওঠে, হঠাৎ করে তার মনে হয় সে বুঝি হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। কষ্ট করে সে দুই পায়ের উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে টেনে যন্ত্রের মতো হেঁটে যেতে থাকে। আরো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কয়েস নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমাকে কেন গুলি করবেন? আমি কী করেছি?"

"তুই কী করেছিস আমার সেটা জানার কথা না। আমাকে বলছে তোর লাশ ফেলতে, আমি তোর লাশ ফেলব।"

"কিন্তু আপনার খারাপ লাগবে না?"

"খারাপ?" পিছনের মানুষটা হঠাৎ যেন খুব অবাক হয়ে গেল, "খারাপ কেন লাগবে?"

"কারণ, আমি মানুষটা হয়তো খারাপ না। হয়তো আমি ভালো মানুষ। নির্দোষ মানুষ—"

পিছনের মানুষটা আবার শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, "তুই ভালো না খারাপ, দোষী না নির্দোষ, তাতে আমার কী আসে-যায়? আমাকে একটা কাজ দিয়েছে সেই কাজ করছি।"

"কেন করছেন?"

পিছনের মানুষটা হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে বেঁকিয়ে উঠল, "চুপ কর হারামজাদা। বকর বকর করিস না।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কয়েস আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম কী?"

পিছনের মানুষটা কয়েসের প্রশ্ন শুনে এত অবাক হল যে, রাগ হতে ভুলে গিয়ে হকচকিয়ে বলল, "কী বললি?"

"আপনার নাম?"

"আমার নাম দিয়ে তুই কী করবি?"

"এমনি জানতে চাই।"

"জেনে কী করবি?"

"কিছু করব না। জানতে ইচ্ছে করছে।" কয়েস অনুনয় করে বলল, "বলবেন?"

কয়েস ভেবেছিল মানুষটি তার নাম বলবে না, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে মানুষটা উত্তর দিল, বলল, "মাজহার।"

কয়েস নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "এইটা কি আপনার সত্যি নাম?"

মাজহার পিছন থেকে কয়েসকে রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিয়ে বলল, "সেই কৈফিয়ত আমার তোকে দিতে হবে নাকি?"

কয়েস ধাক্কা সহ্য করে নরম গলায় বলল, "রাগ করবেন না মাজহার ভাই। আসলে এইটা আপনার সত্যি নাম না হলেও কোনো ক্ষতি নেই। কথা বলার জন্য একটা নাম লাগে, সেই জন্যে। এ ছাড়া আর কিছু না।"

"তোকে কথা বলতে বলেছে কে?"

"কেউ বলে নাই।"

"তা হলে?"

"তবু কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কিছু মনে নিবেন না মাজহার সাহেব।"

কয়েস তার পিছনে দাঁড়ানো মানুষটিকে একবারও দেখে নি, মানুষটি দেখতে কী রকম সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। পায়ের শব্দ এবং মাঝে মাঝে কাপড়ের খসখস শব্দ শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ করে মানুষটিকে দেখতে ইচ্ছে হল কয়েসের। হাঁটতে হাঁটতে মাথা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল সে, সাথে সাথে মাজহার নাইলনের দড়ির বাড়তি অংশটুকু দিয়ে শপাং করে তার মুখে মেরে বসে। যন্ত্রণায় কাতর একটা শব্দ করল কয়েস, মাজহার হিস হিস করে বলল, "খবরদার পিছনে মাথা ঘুরাবি না। খবরদার।"

কয়েস মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে আর ঘুরাব না। আর ঘুরাব না।"

দুইজন আবার চুপচাপ খানিকক্ষণ হেঁটে যায়। নির্জন রাস্তায় শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। দূরে কোথাও ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। অনেক দূরে কোথাও একটি কুকুর ডাকল, হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটিকে কয়েসের কাছে কেমন জানি অতিপ্রাকৃত বলে মনে হতে থাকে। সে নিচু গলায় বলল, "মাজহার সাহেব।"

মাজহার কোনো উত্তর দিল না। কয়েস আবার ডাকল, "মাজহার সাহেব।"

"কী হল?"

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

"কী কথা?"

"আমাকে মেরে আপনি কী পাবেন?"

"টাকা।"

"কত টাকা?"

"সেটা শুনে তুই কী করবি?"

"জানার ইচ্ছা করছে।"

"জেনে কী করবি? তুই শালা আর দশ মিনিট পরে মরে ভূত হয়ে যাবি—"

"তবু শোনার ইচ্ছা করছে।"

"দুই।"

"দুই কী?"

"দুই হাজার।"

কয়েস একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মাত্র দুই হাজার টাকার জন্য আপনি আমারে মারবেন?"

মাজহার রেগে উঠল, "তুই শালা কোন লাট সাহেব যে তোরে মেরে আমি দুই লাখ টাকা পাব?"

কয়েস নরম গলায় বলল, "আপনি আমারে ছেড়ে দেন মাজহার সাহেব, আপনারে আমি বিশ হাজার টাকা দিব।"

মাজহার হা হা করে হেসে উঠল, "তুই বিশ হাজার টাকা দিবি?"

"জে। দিব, খোদার কসম।"

"কীভাবে দিবি?"

"আপনি যেখানে বলবেন সেইখানে পৌঁছে দেব।"

মাজহার কয়েসের পিছন থেকে তার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলল, "তুই আমারে একটা বেকুব পেয়েছিস?"

"কেন মাজহার সাহেব? এই কথা বলছেন কেন?"

"তুই ছাড়া পেলে আর ফিরে আসবি? তুই শালা টিকটিকির বাচ্চা সোজা যাবি পুলিশের কাছে।"

"জি না মাজহার সাহেব। খোদার কসম যাব না। আপনার টাকা আমি বুঝায়ে দিব।"

"কাঁচকলা দিবি।"

"দিব মাজহার সাহেব। আল্লাহর কসম।"

"আচ্ছা যা—মনে করলাম তুই দিলি, তাতে আমার লাভ কী? আমার পার্টির সাথে বেইমানি হল। সেই পার্টি আমারে ছেড়ে দিবে? আমারে আর কাজ দিবে?"

কয়েস কোনো কথা বলল না।

"তোরে মেরে আজ দুই হাজার টাকা পাব। সপ্তাহ দুই পরে আরেকটা কেস আসবে। আরো দুই আড়াই হাজার টাকা। মাসে দুই-তিনটা বান্ধা কেস। আমি তোর বিশ হাজার টাকার লোভে বান্ধা কাজ ফেলে দিব? আমারে তুই বেকুব পেয়েছিস?"

"মাজহার সাহেব আপনি চাইলে আপনাকে আমি চল্লিশ হাজার টাকা দিব। খোদার কসম।"

"চুপ কর শালা। কথা বলিস না। তুই শালা চল্লিশ হাজার কেন, চল্লিশ টাকার কেসও না।"

"মাজহার সাহেব!" কয়েস কাতর গলায় বলল, "বিশ্বাস করেন, আপনাকে সব টাকা আমি বুঝায়ে দিব। আপনি যেখানে চাইবেন, যেভাবে চাইবেন।"

"চুপ কর।" মাজহার ধমক দিয়ে কয়েসকে থামানোর চেষ্টা করল।

কয়েস তবু হাল ছাড়ল না, অনুনয় করে বলল, "বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর কেউ জানবে না। আমি একেবারে উধাও হয়ে যাব। দেশ ছেড়ে চলে যাব—আপনি আপনার বান্ধা কাজ করে যাবেন। কেউ একটা কথা জানবে না। খোদার কসম।"

মাজহার কোনো কথা বলল না। কয়েস কাতর গলায় বলল, "চল্লিশ হাজার না মাজহার সাহেব, আমি আপনাকে পুরো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিব।" এক শ টাকার নোট। পঞ্চাশ হাজার টাকা।

"চুপ কর শালা, বেশি কথা বলিস না। তোর টাকায় আমি পিশাব করে দিই।"

"মাজহার সাহেব, আমাকে ছেড়ে দেন, আমি আপনার জন্য দোয়া করব। আল্লাহর কাছে দোয়া করব।"

"নিজের জন্য দোয়া কর।"

"মাজহার সাহেব, বিশ্বাস করেন আমি কিছু করি নাই। আমি নির্দোষ। আমারে ভুল করে ধরেছেন, কী একটা ভুল হয়েছে। আমার স্ত্রী আছে, ছোট ছেলে আছে। দুই বছরের ছেলে—এতিম হয়ে যাবে। আমারে মারবেন না মাজহার সাহেব। আল্লাহর কসম—"

মাজহার পা তুলে কয়েসের পিঠে একটা লাথি দিয়ে বলল, "চুপ কর হারামজাদা।"

কয়েস তাল হারিয়ে পড়ে যেতে যেতে কোনোমতে নিজেকে সামলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভাঙা গলায় বলল, "মাজহার সাহেব। আপনার কাছে আমি প্রাণ ভিক্ষা চাই। শুধু আমার প্রাণটা ভিক্ষা দেন। আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকব। কেনা গোলাম হয়ে থাকব। সারা জীবনের জন্যে গোলাম হয়ে থাকব।"

মাজহার কোনো কথা বলল না। কয়েস কাতর গলায় বলল, "সারা জীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব। আপনি যা চাইবেন তাই দিব আপনাকে। বিশ্বাস করেন, আমার সম্পত্তি যা আছে—"

মাজহার খেঁকিয়ে উঠে বলল, "কেন শালার ব্যাটা তুই ঘ্যানঘ্যান করছিস? তুই জানিস না ঘ্যানঘ্যান করে কোনো লাভ নাই? মানুষের ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান শুনে আমার কান পচে গেছে। এই নদীর ঘাটে আমি কত মানুষ খুন করেছি তুই জানিস?"

"জানি না মাজহার সাহেব। আমি জানতে চাইও না। আপনি একটা কম খুন করেন। মাত্র একটা। আপনার কসম লাগে।"

মাজহার কোনো উত্তর দিল না, একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল। তারা নদীর তীরে এসে গেছে। এই ঘ্যানঘ্যানে কান্না এখনই শেষ হয়ে যাবে। ব্যাটাকে কথা বলতে দেওয়াই ভুল হয়েছে, ভবিষ্যতে আর কাউকে কথা বলতে দেবে না। মরে যাওয়ার আগে একেকজন মানুষ একেকরকম চিড়িয়া হয়ে যায়। কী যন্ত্রণা!

মাজহার নদীর তীরে দাঁড়িয়ে কয়েসের পিছনে হাত দিয়ে বলল, "এইখানে দাঁড়া।"

কয়েস দাঁড়িয়ে গেল, হঠাৎ করে সে বুঝতে পারল সে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে। তার সারা শরীর অবশ হয়ে আসে, হঠাৎ করে মনে হতে থাকে আর কিছুতেই বুঝি কিছু আসে-যায় না। চারদিকে নরম একটা জ্যোৎস্না, হেমন্তের হালকা কুয়াশা, নদীর পানিতে বহু দূরে গ্রামের টিমটিমে কয়েকটা আলোর প্রতিফলন, ঝিঁঝির একটানা ডাক—কিছুই এখন আর তার চেতনাকে স্পর্শ করছে না।

মাজহার পিছন থেকে কয়েসের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, "হাঁটু গেড়ে বস।"

কয়েস অনেকটা যন্ত্রের মতো হাঁটু গেড়ে বসল, সে আর কিছু চিন্তা করতে পারছে না। মাজহার কঠিন গলায় বলল, "মাথা নিচু কর।"

কয়েস মাথা নিচু করল। মাজহার এবার হেঁটে তার সামনে এসে দাঁড়াল, কয়েস একটা ধাতব শব্দ শুনতে পায়, চোখ না তুলেও সে বুঝতে পারে মাজহার তার হাতে রিভলবারটি তুলে এনেছে। মাজহার ভাবলেশহীন গলায় বলল, "এখন মাথা উঁচু কর।"

কয়েস মাথা উঁচু করল এবং এই প্রথমবার মাজহারকে দেখতে পেল, জ্যোৎস্নার আলোতে চেহারার সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো চোখে পড়ে না কিন্তু যেটুকু চোখে পড়ে তাতে কয়েসের মনে হল মানুষটি সুদর্শন। ছোটখাটো আকার, গলায় একটি কালচে মাফলার ঝুলছে। ডান হাতে একটা বেঢপ রিভলবার কয়েসের কপাল লক্ষ্য করে ধরে রেখেছে।

জ্যোৎস্নার আবছা আলোতে মানুষটির চোখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটুকু দেখে কয়েসের বুকের ভিতর শিরশির করে উঠল।

মাজহার নিচু গলায় বলল, "ন্যাখ—তুই এখন নড়িস না তা হলে সোজা কাজটা কঠিন হয়ে যাবে। চুপচাপ বসে থাক, কিছু বোঝার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে। এই কাজ আমি অনেকবার করেছি, কীভাবে ঠিক করে করতে হয় আমি জানি। তোর উপরে আমার কোনো রাগ নাই, এইটা হচ্ছে একটা বিজনেস।"

কয়েস কাঁপা গলায় বলল, "মাজহার ভাই—"

মাজহার বাধা দিয়ে বলল, "আমার নাম আসলে মাজহার না—"

কথা শেষ করার আগেই মাজহার ট্রিগার টেনে ধরে। নির্জন নদীতীরে একটা ভোঁতা শব্দ হল। কয়েস সেই শব্দটি শুনতে পেল না কারণ বুলেটের গতি শব্দের চেয়ে বেশি।

ওর নামটা আসলে মাজহার নয়, ওর আসল নাম মাওলা। মাওলা বকশ। কয়েস অবাক হয়ে ভাবল, আমি সেটা কেমন করে জানলাম? ঝিঁঝি পোকার কর্কশ ডাক শোনা যাচ্ছিল, হঠাৎ করে সব নীরব হয়ে গেল কেন? কোনো কিছু শুনতে পাচ্ছি না কেন? তা হলে কি আমি মরে গেছি?

কয়েসের স্পষ্ট মনে আছে মাজহার নামের মানুষটা, যার আসল নাম মাওলা বকশ—তার কপালের দিকে একটা রিভলবার তাক করে ধরে রেখেছিল, ট্রিগার টানার পর সে একটা আলোর স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেল, তারপর সবকিছু কেমন জানি এলোমেলো হয়ে গেছে। তা হলে সে কি মরে গেছে? মরে গিয়ে থাকলে সে কেমন করে চিন্তা করছে?

কেউ একজন হাসল। কে হাসল? কেন হাসল? কয়েস নিজের এলোমেলো ভাবটা বিন্যস্ত করে জেগে ওঠার চেষ্টা করে, কী হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করে। জানতে চায়, "আমি কোথায়?"

কয়েস স্পষ্ট শুনতে পেল কেউ একজন বলল, "আমি বলে কিছু নেই।"

কয়েস চমকে ওঠে, "কে কথা বলে?"

"কেউ না।"

"কেউ না?"

"না।"

"তুমি কে?"

"তুমি বলেও কিছু নেই। আমি তুমি বলে কিছুই নেই। সবাই এক।"

কয়েস ছটফট করে ওঠে, "আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

"দেখা! দেখার মানে হচ্ছে কোনো কিছু থেকে প্রতিফলিত আলোর চোখের রেটিনায় এক ধরনের সংবেদন সৃষ্টি করা, যেটা মস্তিষ্ক ব্যাখ্যা করতে পারে। পুরো ব্যাপারটি নির্ভর করে কিছু জৈবিক প্রক্রিয়ার ওপর। একটা জিনিস মানুষ দেখে একভাবে, পশুপাখি দেখে অন্যভাবে, কীটপতঙ্গ দেখে আবার সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। কাজেই তুমি যখন বলছ দেখতে পাচ্ছ না তার অর্থ খুব অস্পষ্ট। দেখা ব্যাপারটি অস্পষ্ট! সত্যি কথা বলতে কী, দেখা ব্যাপারটি অত্যন্ত আদিম একটা প্রক্রিয়া—"

কয়েস বলল, "তবু আমি দেখতে চাই। মানুষের মতো দেখতে চাই।"

"বেশ! দেখতে চাইলেই দেখা যায়।"

কয়েস দেখতে চাইল এবং হঠাৎ করে সবকিছু তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কয়েস

একসাথে পুরো পৃথিবীটা দেখতে পায়। পৃথিবীর গাছপালা, নদী, সাগর, আকাশ-বাতাস, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, মানুষ, মানুষের বসতি, শহর নগরী সবকিছু দেখতে পেল। সবকিছু তার সামনে স্থির হয়ে আছে, যেন পুরো পৃথিবীটা তার সামনে স্থির হয়ে আছে। যেন পৃথিবীটাকে কেউ থামিয়ে দিয়েছে।

কয়েস অবাক হয়ে দেখে—সম্পূর্ণ নতুনভাবে দেখা, যেটি সে আগে কখনো দেখে নি। কয়েস নিজের ভিতরে এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করে—সে তো এতকিছু এভাবে দেখতে চায় নি।

"তা হলে কী দেখতে চেয়েছ?"

"আমি নদীতীরে মাজহার নামের মানুষটিকে দেখতে চেয়েছি। সে আমার মাথায় রিভলভার ধরে রেখেছিল। যার আসল নাম মাজহার নয়—যার নাম মাওলা। মাওলা বকশ—"

"বেশ।"

কয়েস সাথে সাথে মাজহারকে দেখতে পেল। হাতে একটি বেঢপ রিভলভার চেপে নিয়ে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারায় এক ধরনের কাঠিন্য। তার পায়ের কাছে একটি দেহ কুঁকড়ে শুয়ে আছে। দেহটিকে চিনতে পারল—তার নিজের দেহ। কয়েস অবাক হয়ে দেখল মাজহার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রিভলবারের নল থেকে যে ধোঁয়া বের হয়েছে সেটিও স্থির হয়ে আছে। আকাশে আধখানা চাঁদ তার মাঝে কোমল এক ধরনের কুয়াশা। নদীর পানি কাচের মতো স্থির। কয়েস আতঙ্কে কেমন যেন শিউরে উঠল। ভাবল, তা হলে কি আমি মরে গেছি?

কেউ একজন আবার নিচু গলায় হাসল। কে হাসে? কয়েস চিৎকার করে জিজ্ঞেস করতে চাইল তা হলে কি আমাকে মেরে ফেলেছে? আমি কি মৃত? "আমি তুমি বলে কিছু নেই। আসলে জন্ম-মৃত্যু বলেও কিছু নেই। এখানে সবাই মিলে একটি প্রাণ। একটি অস্তিত্ব। একটি প্রক্রিয়া।"

"প্রক্রিয়া?"

"হ্যাঁ। সেই প্রক্রিয়ার তুমি একটি অংশ। মাজহার একটি অংশ। মাজহার ইচ্ছে করলে আমি হতে পারে, তুমিও ইচ্ছে করলে মাজহার হতে পার। তোমরা আসলে একই মানুষ। একই প্রাণের অংশ। একই অস্তিত্বের অংশ।"

কয়েস অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল। যে মানুষটি তাকে হত্যা করেছে সেই মানুষটি এবং সে নিজে একই মানুষ? কিন্তু সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

"কারণ সময়কে থামিয়ে রাখা হয়েছে।"

"সময়কে চালিয়ে দেওয়া যাবে?"

উত্তর পেতে তার একটু দেরি হল। দ্বিধান্বিত স্বরে কেউ একজন বলল, "হ্যাঁ। যাবে।"

কয়েস নিজের ভিতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে। আশ্চর্য এক ধরনের শূন্যতা, আদি-অন্তহীন নিঃসীম এক ধরনের শূন্যতা। সে ক্লান্ত গলায় অনিশ্চিত স্বরে বলল, "তুমি কে আমার সাথে কথা বলছ?"

কেউ একজন হাসল। হেসে বলল, "আমি কেউ না। আমার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি হচ্ছি তুমি। তুমি হচ্ছ আমি। তুমি নিজের সাথে কথা বলছ।"

"আমি নিজের সাথে কথা বলছি?"

"হ্যাঁ, তুমি নিজের সাথে কথা বলছ।"

কয়েস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি আর মাজহার একই অস্তিত্ব?"

"হ্যাঁ। তোমরা একই অস্তিত্ব। তোমরা একই মানুষ।"

"আমি মাজহারকে বুঝতে চাই।"

"কী বুঝতে চাও?"

"কেমন করে সে এত নিষ্ঠুর হয়? এত অমানুষ হয়?"

কেউ একজন আবার হাসল। হেসে বলল, "তোমার বিশাল অস্তিত্বে এইসব অর্থহীন। এইসব তুচ্ছ! তোমার মুক্তি হয়েছে। তুমি জান এইসব হচ্ছে ছোট ছোট পরীক্ষা। ছোট ছোট কৃত্রিম প্রক্রিয়া—"

কয়েস বাধা দিয়ে বলল, "আমি তবু মাজহারকে বুঝতে চাই।"

"সেটি হবে অপ্রয়োজনীয় একটি প্রক্রিয়া। অর্থহীন মূল্যহীন একটি প্রক্রিয়া।"

"আমি তবু বুঝতে চাই।"

কেউ একজন দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, "বেশ।"

হঠাৎ করে কয়েস আবিষ্কার করল সে আসলে কয়েস নয়, সে মাজহার। তার আসল নাম মাওলা বকশ। সে একটা জুটমিলের মেকানিক। তার একটি কমবয়সী স্ত্রী রয়েছে। বখে যাওয়া একটি পুত্র রয়েছে। মাজহারের শৈশবকে মনে পড়ল তার। শৈশবের দুঃসহ জীবন, অমানুষিক নির্যাতন, বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা মনে পড়ল। আনন্দহীন ভালবাসাহীন একটি নিষ্ঠুর জীবনের কথা মনে পড়ল। দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন আর অপমানে নিজেকে পাষাণ হয়ে যেতে দেখল। ঘৃণায় এবং জিঘাংসায় নিজেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে দেখল। কয়েস তার নিজের সাথে, মাজহারের সাথে কথা বলল—তাকে বুঝতে চাইল। তাকে সে বুঝতে পারল না। তবুও সে তার মনের গহিনে, মস্তিষ্কের আনাচে-কানাচে, চেতনার সীমানায় ঘুরে বেড়াল। একসময় সে ক্লান্ত হয়ে বলল, "আমি আর মাজহার হয়ে থাকতে চাই না।"

"বেশ। তুমি তা হলে কী হতে চাও?"

"আমি আমার নিজের থাকতে চাই।"

"নিজ বলে কিছু নেই। তোমার মুক্তি হয়েছে। তুমি এখন সব। তুমি এখন আমার বিশাল অস্তিত্বের অংশ। তুমি এখন—"

"আমি কি সময়কে পিছু নিয়ে যেতে পারি?"

"পিছু?"

"হ্যাঁ।"

"কত পিছু?"

"আমার শেষ অংশটুকু। জীবনের শেষ অংশটুকু?"

"কী বলছ তুমি? সেটি অর্থহীন মূল্যহীন তুচ্ছ একটি পরীক্ষা। নগণ্য একটি প্রক্রিয়া।"

"আমি তবু আরো একবার সেটি দেখতে চাই। আরো একবার তার ভিতর দিয়ে যেতে চাই। আরো একবার—"

"কী বলছ তুমি?"

"আমি সত্যি বলছি।"

কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর কেউ একজন একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "বেশ।"

হেমন্তের কুয়াশা ঢাকা পথে কয়েস হেঁটে যাচ্ছে। অন্ধকার নেমে এসেছে, জ্যোৎস্নায় এক ধরনের আলো-আঁধারের খেলা নেমে এসেছে। অনেক দূরে কোথাও একটা কুকুর ডাকল, ঝিঁঝি পোকা কর্কশ স্বরে ডাকছে।

কয়েসের হাত পিছন থেকে বাঁধা, নাইলনের দড়ি টান দিয়ে পিছনের মানুষটি বলল, "এখানে দাঁড়া।"

কয়েস হঠাৎ করে বুঝতে পারল সে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে। তার সারা শরীর অবশ হয়ে আসে। হঠাৎ করে মনে হয় তার কিছুতেই কিছু আসে-যায় না। পিছনের মানুষটি বলল, "হাঁটু গেড়ে বস।" কয়েস হাঁটু গেড়ে বসল। পিছনের মানুষটা হেঁটে কয়েসের সামনে এসে দাঁড়াল। একটা ধাতব শব্দ শুনে কয়েস মাথা তুলে তাকাল। হঠাৎ করে মনে হতে থাকে এই ব্যাপারটি আগে কখনো ঘটেছে। কখন ঘটেছে সে মনে করতে পারে না। মানুষটি হাতে একটি বেটপ রিভলবার নিয়ে তার কপালের দিকে তাক করে ধরে। নিচু গলায় বলে, "ন্যাথ—এখন তুই নড়িস না। তা হলে সোজা কাজটা কঠিন হয়ে যাবে। চুপচাপ বসে থাক—"

কয়েস বাধা দিয়ে বলল, "মাজহার সাহেব—"

মানুষটি থতমত খেয়ে থেমে যায়। ভুরু কুঁচকে সে কয়েসের দিকে তাকাল, বলল, "কী বলিস?"

"কিছু না। বলছিলাম কী, কিছুতেই আর কিছু আসে-যায় না। আপনার ওপর আমার কোনো রাগ নেই। আমি জানি এইটা একটা বিজনেস।"

মানুষটা কয়েক মুহূর্ত রিভলবারটা ধরে রেখে ধীরে ধীরে হাতটা নামিয়ে আনে। একটা নিশ্বাস ফেলে সে নদীর দিকে তাকাল। তারপর অন্যমনস্কভাবে নদীর পানির দিকে এগিয়ে গেল। দূরে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে।

কয়েস নিচু গলায় ডাকল, "মাওলা সাহেব। দড়িটা একটু খুলে দেবেন? হাতে বড় জোরে বেঁধেছেন।"

মাজহার নামের মানুষটি, যার আসল নাম মাওলা বকশ, মাথা ঘুরিয়ে কয়েসের দিকে তাকাল, কাঁপা গলায় বলল, "কী বলিস?"

"আপনার নাম তো আসলে মাওলা বকশ। তাই না?"

"তুই কেমন করে জানিস?"

"আমি জানি। আপনি আর আমি তো আসলে একই মানুষ। তাই না?"

সোলায়মান আহমেদ ও মহাজাগতিক প্রাণী

"আপনি বলতে চাইছেন আপনাকে মহাজাগতিক কোনো প্রাণী ধরে নিয়ে গিয়েছিল?"

দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি সোলায়মান আহমেদ মাইক্রোফোনের সামনে ঝুঁকে পড়ে স্পষ্ট গলায় বললেন, "হ্যাঁ।"

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় চল্লিশ জন সাংবাদিকের অনেকেই এক ধরনের অস্পষ্ট শব্দ করলেন। কয়েকজনের ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলে উঠল এবং আরো কিছু ছবি নেওয়া হল। বিশিষ্ট শিল্পপতি সোলায়মান আহমেদের একেবারে হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি সংবাদপত্রে যেরকম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল হঠাৎ করে ফিরে এসে এই ধরনের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া নিশ্চিতভাবেই তার থেকে অনেক বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

"আপনাকে কীভাবে মহাজাগতিক প্রাণী ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেটি কি একটু বলবেন?"

"সোলায়মান আহমেদ একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "পুরো ব্যাপারটি আমার কাছে এক ধরনের আবছা এবং ধোঁয়াটে। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে নদীতীরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ এক ধরনের ভোঁতা শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা কোথা থেকে আসছে সেখার জন্য মাথা ঘুরিয়েছি তখন দেখি আমার পিছনে গোলাকার মসৃণ একটা কিছু দশ-বারো ফুট উপরে ভেসে আছে। সেখান থেকে নীল রঙের আলো বের হয়ে এল তারপর আমার কিছু মনে নাই। যখন জ্ঞান হল আমি দেখলাম আমি ভেসে আছি।"

সোলায়মান আহমেদ চুপ করলেন এবং সাংবাদিকেরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। শেষ পর্যন্ত একজন জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় ভেসে আছেন?"

"ভরশূন্য পরিবেশে। একটা গোলাকার জানালা ছিল সেখান দিয়ে আমি পৃথিবীকে দেখতে পেয়েছি। পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখাচ্ছিল তবে নীল এবং সাদা রঙের।"

"আপনি কেমন করে বুঝলেন সেটা পৃথিবী? অন্য কোনো গ্রহও তো হতে পারত।"

"আমি আফ্রিকা মহাদেশটি দেখেছি। কাজেই আমি নিশ্চিতভাবে জানি সেটা পৃথিবী।"

মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ গলা উঁচিয়ে বললেন, "আপনি কি কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারবেন যে আপনাকে মহাজাগতিক প্রাণী ধরে নিয়ে গিয়েছিল?"

সোলায়মান আহমেদ মাথা নাড়লেন, বললেন, "না। যা ঘটেছে আমি শুধু সেটা বলতে পারি। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন কি না সেটা আপনাদের ইচ্ছে।"

"আপনার কাছে কি কোনো প্রমাণ নেই? সেই মহাকাশযানের কোনো জিনিস, কোনো ছবি, কোনো তথ্য?"

সোলায়মান আহমেদ খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "না। আমাকে তারা পরীক্ষা করেছে, আমার শরীরে কিছু প্রবেশ করিয়েছে কি না দেখতে হবে। আমার কাছে কোনো তথ্য নেই, তবে আমার পকেটে যে নোট বই ছিল সেই নোট বইয়ে আমার বল পয়েন্ট কলম দিয়ে আমি সেই মহাজাগতিক প্রাণীর একটা ছবি এঁকেছিলাম। ভরশূন্য অবস্থায় ভাসছিলাম বলে ছবিটা ভালো হয় নি। কিন্তু সেটা একমাত্র তথ্য।"

বেশ কয়েকজন সাংবাদিক একসাথে সেই ছবিটি দেখতে চাইলেন। সোলায়মান আহমেদ পকেট হাতড়ে একটা নোট বই খুঁজে বের করে তার মাঝখানে আঁকা মহাজাগতিক প্রাণীর ছবিটি দেখালেন। বড় মাথা, ছোট ছোট হাত-পা, গোল চোখ। সাংবাদিকরা আবার নোট বই হাতে সোলায়মান আহমেদের ছবি তুলতে লাগলেন।

সাগর তার বাবার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, "আব্বু চল যাই।"

সাগরের আব্বা একটু বিরক্ত হয়ে চাপা গলায় বললেন, "কয়েক মিনিট চুপ করে থাকতে পারিস না? আমি একটা প্রেস কনফারেন্স কাভার করছি দেখছিস না?"

"লোকটা মিথ্যা কথা বলছে আর তোমরা বসে বসে শুনছ?"

সাগরের গলার স্বর হঠাৎ করে একটু উঁচু হয়ে যাওয়ায় অনেকে তার দিকে ঘুরে তাকাল। সাগরের আব্বা খুব অপ্রস্তুত হয়ে কীভাবে সাগরকে আড়াল করবেন সেটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলেন কিন্তু কয়েকজন সাংবাদিক তার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। একজন গলা উঁচিয়ে বললেন, "তুমি কে খোকা? তুমি কেমন করে জান সোলায়মান সাহেব মিথ্যা কথা বলছেন?"

সাগরের আব্বা খুব বিব্রত হয়ে বললেন, "ওর কথায় কান দেবেন না। বাচ্চা ছেলে কী বলতে কী বলেছে! স্কুল আগে ছুটি হয়ে গেছে বলে আমি সাথে নিয়ে এসেছি। আমি খুব দুঃখিত।"

সাংবাদিকটি নাছোড়বান্দার মতো বললেন, "কিন্তু তুমি কেন বলছ সোলায়মান সাহেব মিথ্যা কথা বলছেন?"

এবার হঠাৎ করে সব সাংবাদিক সাগরের দিকে ঘুরে তাকালেন, সাগর কেমন ভয় পেয়ে যায়। শুকনো গলায় বলল, "ঐ যে ইনি বললেন, বল পয়েন্ট কলম—"

"কী হয়েছে বল পয়েন্ট কলমে?"

"ভরশূন্য জায়গায় বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লেখা যায় না। কালিটা নিচে চুইয়ে আসতে হয়—খাড়া দেয়ালেও লেখা যায় না—আসলে উল্টো করে ধরলেও লেখা যায় না—মানে—" সাগর হঠাৎ ভয় পেয়ে থেমে গেল।

একসাথে অনেকগুলো ক্যামেরা ক্লিক করে ওঠে এবং ক্যামেরার ফ্লাশের আলোতে সাগরের চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

একজন সাংবাদিক হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে ওঠেন, "সোলায়মান সাহেব কোথায় গেলেন?"

কম বয়সী একজন বললেন, "মহাজাগতিক প্রাণী ধরে নিয়ে গেছে!"

চল্লিশ জন সাংবাদিকের উচ্চৈঃস্বরে হাসির শব্দ সোলায়মান সাহেব তার গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়েও স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

মহাজাগতিক কিউরেটর

সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সন্তুষ্ট হল। প্রথম প্রাণীটি বলল, "এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে।"

"হ্যাঁ।"

"বেশ পরিণত প্রাণ। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রজাতি। একেবারে ক্ষুদ্র এককোষী থেকে শুরু করে লক্ষ-কোটি কোষের প্রাণী।"

দ্বিতীয় প্রাণীটি আরো একটু খুঁটিয়ে দেখে বলল, "না। আসলে এটি জটিল প্রাণ নয়। খুব সহজ এবং সাধারণ।"

"কেন? সাধারণ কেন বলছ? তাকিয়ে দেখ কত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণ। শুরু হয়েছে ভাইরাস থেকে, প্রকৃতপক্ষে ভাইরাস আলাদাভাবে প্রাণহীন বলা যায়। অন্য কোনো প্রাণীর সংস্পর্শে এলেই তার মাঝে জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। তারপর রয়েছে এককোষী প্রাণ, পরজীবী ব্যাক্টেরিয়া। তারপর আছে গাছপালা, এক জায়গায় স্থির। আলোক সংশ্লেষণ দিয়ে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নিচ্ছে। পদ্ধতিটা বেশ চমৎকার। গাছপালা ছাড়াও আছে কীটপতঙ্গ। তাকিয়ে দেখ কত রকম কীটপতঙ্গ। পানিতেও নানা ধরনের প্রাণী আছে, তাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন। ডাঙ্গাতেও নানা ধরনের প্রাণী, কিছু কিছু শীতল রক্তের কিছু কিছু উষ্ণ রক্তের। উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটির ভিতরে আবার অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।"

"কিন্তু সব আসলে বাহ্যিক। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাঝে আসলে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।"

প্রথম প্রাণীটি বলল, "আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন এই পার্থক্যকে বাহ্যিক বলছ।"

"তুমি আরেকটু খুঁটিয়ে দেখ। এই ভিন্ন প্রজাতি কী দিয়ে তৈরি হয়েছে দেখ।"

প্রথম প্রাণীটি একটু খুঁটিয়ে দেখে বিস্ময়সূচক শব্দ করে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। এই প্রাণীগুলো সব একইভাবে তৈরি হয়েছে। সব প্রাণীর জন্য মূল গঠনটি হচ্ছে ডিএনএ দিয়ে, সব প্রাণীর ডিএনএ একই রকম, সবগুলো একই বেস পেয়ার দিয়ে তৈরি। সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে জটিল প্রাণীটির একই রকম গঠন। প্রাণীটির বিকাশের নীলনকশা এই ডিএনএ দিয়ে তৈরি করে রাখা আছে। কোনো প্রাণীর নীলনকশা সহজ, কোনো প্রাণীর নীলনকশা জটিল—এটুকুই হচ্ছে পার্থক্য।"

"হ্যাঁ।" দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, "আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীগুলোকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি—কাজটি সহজ নয়। এই গ্রহ থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীটি খুঁজে বের করতে হবে—যেহেতু সবগুলো প্রাণীর গঠন একই রকম, কাজটি আরো কঠিন হয়ে গেল।"

"সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।"

"হ্যাঁ।"

"এই ভাইরাস কিংবা ব্যাক্টেরিয়া বেশি ছোট, এর গঠন এত সহজ এর মাঝে কোনো বৈচিত্র্য নেই।"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। আবার এই হাতি বা নীল তিমি নিয়েও কাজ নেই, এদের আকার বেশি বড়। সংরক্ষণ করা কঠিন হবে।"

"গাছপালা নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। এরা এক জায়গায় স্থির থাকে। যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে সেখানে স্থির প্রাণ নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।"

"এই প্রাণীটি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? এটাকে বলে সাপ।"

"সাপটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু এটা সরীসৃপ। সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয়, ঠাণ্ডার মাঝে এরা কেমন যেন স্থবির হয়ে পড়ে। প্রাণিজগতে সরীসৃপ একটু পিছিয়ে পড়া প্রাণী।"

"ঠিকই বলেছ। তা হলে সরীসৃপ নিয়ে কাজ নেই।"

প্রথম প্রাণীটি বলল, "আমার এই প্রাণীটি খুব পছন্দ হয়েছে। এটাকে বলে পাখি। কী চমৎকার! আকাশে উড়তে পারে!"

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, "হ্যাঁ, আমারও এটি পছন্দ হয়েছে। আমরা এই প্রাণীটিকে নিতে পারি। তবে—"

"তবে কী?"

"এদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই। আমাদের কি এমন কোনো প্রাণী নেওয়া উচিত নয় যারা বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন দেখিয়েছে, যারা কোনো ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলেছে?"

"ঠিকই বলেছ। তা হলে আমাদের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একবার দেখা উচিত।"

"এই দেখ একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী। কী সুন্দর হলুদের মাঝে কালো ডোরাকাটা! এর নাম বাঘ।"

"হ্যাঁ প্রাণীটি চমৎকার। কিন্তু এটি একা একা থাকতে পছন্দ করে। একটা সামাজিক প্রাণী নিতে পারি না?"

"কুকুরকে নিলে কেমন হয়? এরা একসাথে থাকে। দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।"

প্রথম প্রাণীটি বলল, "এই প্রাণীটিকে মানুষ পোষ মানিয়ে রেখেছে, প্রাণীটা নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে।"

"ঠিকই বলেছ, গৃহপালিত প্রাণীগুলোর মাঝে নিজস্ব স্বকীয়তা লোপ পেয়ে যাচ্ছে। একটা খাঁটি প্রাণী নেওয়া প্রয়োজন। হরিণ নিলে কেমন হয়?"

"তৃণভোজী প্রাণী। তার অর্থ জান?"

"কী?"

"এদের দীর্ঘ সময় খেতে হয়। বেশিরভাগ সময় এটা ঘাস লতাপাতা খেয়ে কাটায়।"

"ঠিকই বলেছ। আমরা দেখছি কোনো প্রাণীই পছন্দ করতে পারছি না।"

"আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে।"

"কী?"

"এই গ্রহটিতে যে প্রাণীটি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই প্রাণীটি নিলে কেমন হয়?"

"কোন প্রাণীর কথা বলছ?"

"মানুষ।"

"মানুষ?"

"হ্যাঁ। দেখ এদের একটা সামাজিক ব্যবস্থা আছে। সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে। এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী।"

"ঠিকই বলেছ।"

"এই দেখ এরা শহর-বন্দর-নগর তৈরি করেছে। কত বিশাল বিশাল নগর তৈরি করেছে।"

"শুধু তাই না, দেখ এরা চাষাবাদ করছে। পশু-পালন করছে।"

"যখন কোনো সমস্যা হয় তখন এরা দলবদ্ধভাবে সেটা সমাধান করার চেষ্টা করে।"

"নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য এদের কত আত্মত্যাগ রয়েছে দেখেছ?"

"কিন্তু আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে—"

"কী?"

"তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর মানুষ এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী?"

"তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করছ?"

"এই পৃথিবীর দিকে তাকাও। দেখেছ বাতাস কত দূষিত পদার্থ? কত তেজস্ক্রিয় পদার্থ? বাতাসের ওজোন স্তর কেমন করে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখেছ? গাছ কেটে কত বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করেছে দেখেছ?"

"এর সবই কি মানুষ করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কী আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম এরা বুদ্ধিমান প্রাণী।"

"এরা একে অন্যের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে। যুদ্ধ করে একজন আরেকজনকে ধ্বংস করে ফেলছে। প্রকৃতিকে এরা দূষিত করে ফেলেছে।"

"ঠিকই বলেছ।"

প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ বেশ মনোযোগ দিয়ে মানুষকে লক্ষ করল, তারপর প্রথম প্রাণীটি বলল, "না, মানুষকে নেওয়া ঠিক হবে না। এরা মাত্র দুই মিলিয়ন বছর আগে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এর মাঝেই শুধু যে নিজেদেরকে বিপন্ন করেছে তাই নয়, পুরো গ্রহটিকে ধ্বংস করে ফেলার অবস্থা করে ফেলেছে।"

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, "মহাজাগতিক কাউন্সিল আমাদেরকে কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে। আমাদের খুব চিন্তা-ভাবনা করে প্রাণীগুলো বেছে নিতে হবে। এই সুন্দর গ্রহ থেকে এ রকম স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী প্রাণী আমরা নিতে পারি না। কিছুতেই নিতে পারি না।"

প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং হঠাৎ করে প্রথম প্রাণীটি আনন্দের ধ্বনি করে ওঠে। দ্বিতীয় প্রাণীটি অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"আমি একটা প্রাণী খুঁজে পেয়েছি। এরাও সামাজিক প্রাণী। এরাও দল বেঁধে থাকে। এদের মাঝে শ্রমিক আছে সৈনিক আছে। বংশ বিস্তারের জন্য চমৎকার একটা পদ্ধতি আছে। দেখ নিজেদের থাকার জন্য কী চমৎকার বিশাল বাসস্থান তৈরি করেছে!"

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, "ঠিকই বলেছ। দেখ এরাও মানুষের মতো চাষাবাদ করতে পারে। মানুষ যেরকম নিজেদের সুবিধার জন্য পশুপালন করতে পারে এদেরও ঠিক সেরকম ব্যবস্থা রয়েছে!"

"কী সুশৃঙ্খল প্রাণী দেখেছ?"

"শুধু সুশৃঙ্খল নয়, এরা অসম্ভব পরিশ্রমী, গায়ে প্রচণ্ড জোর, নিজের শরীর থেকে দশগুণ বেশি জিনিস অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে।"

"হ্যাঁ। কোনো ঝগড়াবিবাদ নেই। কে কোন কাজ করবে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে। কোনো রকম অভিযোগ নেই, যে যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।"

"অত্যন্ত সুবিবেচক। আগে থেকে খাবার জমিয়ে রাখছে। আর বিপদে কখনো দিশেহারা হয় না। অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে।"

"মানুষের বয়স মাত্র দুই মিলিয়ন বছর, সেই তুলনায় এরা সেই ডাইনোসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে।"

"প্রকৃতির এতটুকু ক্ষতি করে নি। আমি নিশ্চিত মানুষ নিজেদের ধ্বংস করে ফেলার পরও এরা বেঁচে থাকবে। পৃথিবী এক সময় এরাই নিয়ন্ত্রণ করবে।"

"ঠিকই বলেছ। তা হলে আমরা এই প্রাণীটাই নিয়ে যাই?"

"হ্যাঁ। পৃথিবীর এই চমৎকার প্রাণীটা নেওয়াই সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ হবে।"

দুজন মহাজাগতিক কিউরেটর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি থেকে কয়েকটি পিপড়া তুলে নিয়ে গ্যালাক্সির অন্য গ্রহ-নক্ষত্রে রওনা দেয়, দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করছে।

জলজ

"যুল। ঘুম থেকে ওঠ।"

যুলের মনে হয় অনেকদূর থেকে কেউ যেন তাকে ডাকছে। গলার স্বরটি চেনা কিন্তু সেটি কার যুল মনে করতে পারল না। যুল গভীর ঘুম থেকে জেগে ওঠার চেষ্টা করতে করতে আবার অচেতনতার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল, তখন সে শুনতে পেল আবার তাকে কেউ একজন ডাকল, "যুল। ওঠ।"

যুল প্রাণপণ চেষ্টা করে জেগে উঠতে, মনে করতে চেষ্টা করে সে কে, সে কোথায়, কে তাকে ডাকছে, কেন তাকে ডাকছে। কিন্তু তার কিছুই মনে পড়ে না। সে অনুভব করে এক গভীর জড়তায় তার দেহ আর চেতনা যেন কোথাও অবরুদ্ধ হয়ে আছে, তার ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না।

"ওঠ যুল। আমরা পৃথিবীর কাছাকাছি চলে এসেছি।"

পৃথিবী! হঠাৎ করে যুলের সব কথা মনে পড়ে যায়, পৃথিবী হচ্ছে সূর্য নামক সাদামাঠা একটা নক্ষত্রের মহাকর্ষে আটকে থাকা নীলাভ একটি ছোট গ্রহ। যে গ্রহে তার পূর্বপুরুষ মানুষের জন্ম হয়েছিল। যে মানুষ রোবটদের নিয়ে ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জে বসতি করেছে দুই শতাব্দী আগে। সেই ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জ থেকে সে ফিরে যাচ্ছে পৃথিবীতে। সূর্য নামক সাদামাঠা একটি নক্ষত্রের কক্ষপথে আটকে থাকা তৃতীয় গ্রহটিতে।

যুল খুব ধীরে ধীরে তার চোখ খুলে তাকাল, তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে একটি ধাতব মুখ। সেই ধাতব মুখে তার জন্য উৎকণ্ঠা, তার জন্য মমতা।

যুলকে চোখ খুলতে দেখে ধাতব মুখটি আরো নিচু হয়ে এল, শীতল ধাতব হাতে তার মুখমণ্ডল স্পর্শ করে বলল, "তুমি প্রায় এক যুগ থেকে ঘুমিয়ে আছ যুল। তোমার এখন ওঠার সময় হয়েছে।"

যুল ধাতব মুখ, তার শীতল স্পর্শ এবং কোমল কণ্ঠটি চিনতে পারে। এটি ক্রন, একজন রোবট ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জ থেকে তার সাথে এসেছে। প্রায় একযুগ দীর্ঘ মহাকাশ অভিযানে তাকে একা একা আসতে দেয় নি ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জের বিজ্ঞান একাডেমি। তার সাথে দিয়েছে একজন রোবট, যার নাম ক্রন এবং একজন আধা জৈবিক আধা যান্ত্রিক বায়োবট যার নাম কীশ। বার্ধক্য তাদের স্পর্শ করে না বলে গত এক যুগ তারা এই মহাকাশযানের শূন্য করিডোরে অপেক্ষা করেছে, ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছে, শীতল ঘরের কালো ক্রোমিয়াম ক্যাপসুলে যুলের দেহকে চোখে চোখে রেখেছে। যুল ক্রনের ধাতব অথচ কোমল মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ভালো আছ ক্রন?"

"হ্যাঁ। আমি ভালো আছি?"

"কীশ কোথায়? কীশ ভালো আছে?"

"কীশ মূল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে। সেও ভালো আছে।"

যুল আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ক্রন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এখন তুমি কথা বলবে না যুল। তুমি চুপ করে শুয়ে থাকবে। তুমি প্রায় এক যুগ শীতল ঘরে ঘুমিয়ে ছিলে। তোমার দেহকে খুব ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলতে হবে।"

"আমি তো জেগেই আছি!"

"তোমার মস্তিষ্ক জেগে আছে, কিন্তু তোমার দেহ এখনো জেগে ওঠে নি। আমাকে একটু সময় দাও আমি তোমার দেহকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলব।"

"বেশ।"

যুল ক্রোমিয়ামের কালো ক্যাপসুলে নিশ্চল হয়ে রইল। সে খুব ধীরে ধীরে অনুভব করে তার দেহে আবার প্রাণ ফিরে আসছে। শরীরের ভিতরে এক ধরনের উষ্ণতা বইতে শুরু করেছে, হাত, পা, বুক, পিঠে এক ধরনের জীবন্ত অনুভূতির জন্ম হয় এবং একসময় খুব ধীরে ধীরে সে নিজের ভিতরে হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনতে পায়। সে বুকভরে একটি নিশ্বাস নিয়ে খুব ধীরে ধীরে নিজের দুই হাত চোখের সামনে মেলে ধরল, আঙুলগুলো একবার মুষ্টিবদ্ধ করে আরেকবার খুলে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রনকে বলল, "আমি পুরোপুরি জেগে উঠেছি ক্রন।"

ক্রন ক্যাপসুলের ওপরে লাগানো কিছু মনিটরে চোখ বুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ। তুমি জেগে উঠেছ। তুমি এবারে উঠে দাঁড়াতে পার।"

যুল খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ক্রন তাকে হাত ধরে শীতল মেঝেতে নামিয়ে এনে উজ্জ্বল কমলা রঙের একটি নিও পলিমারের পোশাক দিয়ে তার দেহকে ঢেকে দেয়। যুল মহাকাশযানের দেয়াল স্পর্শ করে নিজের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আমি কাঁপন অনুভব করছি। মহাকাশযানের ইঞ্জিন চালু করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। পৃথিবীতে নামার জন্য গতিপথ পরিবর্তন করতে হচ্ছে।"

"ও।"

"আমরা চেয়েছিলাম তুমি পৃথিবীকে দেখ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে যখন যাবে সেই উত্তাপ অনুভব কর। এই গ্রহটিতে তোমার এবং আমার সবার পূর্বপুরুষের জন্ম হয়েছিল।"

"হ্যাঁ।" যুল কোনোভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, "হ্যাঁ আমি পৃথিবীকে সত্যি সত্যি দেখতে চাই।"

"এস আমার সাথে। আমার হাত ধর।"

যুল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "তার প্রয়োজন নেই ক্রন। আমার মনে হয় আমি নিজের ভারসাম্য ফিরে পেয়েছি।"

যুল একটু টলতে টলতে হেঁটে মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর কীশ ঝুঁকে কিছু একটা দেখছিল, পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকিয়ে যুলকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল, যুল! ঘুম ভাঙল তা হলে?"

"হ্যাঁ, ভেঙেছে!"

"আমরা পৃথিবীর কাছাকাছি এসে গেছি। কিছুক্ষণের মাঝেই পৃথিবীর কক্ষপথে আটকে যাব।"

"চমৎকার! কত বড় কক্ষপথ?"

"চেষ্টা করছি কাছাকাছি যাবার। এক শ ইউনিট, বায়ুমণ্ডলটা পার হয়েই।"

"পৃথিবী কি দেখা যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ এই দেখ"—বলে কীশ কোথায় একটা সুইচ স্পর্শ করতেই হঠাৎ করে সামনে বিশাল একটা স্ক্রিনে পৃথিবীর ছবি ভেসে আসে। নীল গ্রহটির ওপর সাদা মেঘ, গ্রহটি ঘিরে খুব সূক্ষ্ম একটি নীলাভ আবরণ, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চিহ্ন।

যুল কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে, বুকের ভিতর আটকে থাকা একটা নিশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "কী সুন্দর দেখেছ!"

কীশ যুলের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

যুল বিশাল স্ক্রিন থেকে চোখ ফিরিয়ে একবার কীশ আরেকবার ক্রনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হল? তোমরা কোনো কথা বলছ না কেন? তোমাদের কাছে সুন্দর মনে হচ্ছে না?"

"হচ্ছে।" কীশ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তবে—"

"তবে কী?"

"আমি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণ করে দেখেছি—"

"কী দেখেছ?"

"দেখেছি এই বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত।"

যুল চমকে উঠে বলল, "কী বললে?"

কীশ কাতর মুখে বলল, "আমি দুঃখিত যুল তুমি এত আশা করে সেই সুদূর ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জ থেকে পৃথিবীতে এসেছ তোমার পূর্বপুরুষের জন্মগ্রহ দেখতে। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দেখে আমার মনে হচ্ছে—"

কীশ হঠাৎ থেমে যায়। তারপর ইতস্তত করে বলল, "মনে হচ্ছে—"

"কী মনে হচ্ছে?"

"মনে হচ্ছে এই গ্রহ প্রাণহীন।"

"প্রাণহীন?"

"হ্যাঁ। প্রাণহীন। বাতাসের ওজোন স্তর পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন, আলট্রা ভায়োলেট রে সরাসরি পৃথিবীকে আঘাত করেছে। বাতাসে মাত্রাতিরিক্ত ভায়োক্সিন, প্রয়োজনের অনেক বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নানা ধরনের এসিড। সবচেয়ে যেটি ভয়ঙ্কর সেটি হচ্ছে অক্সিজেনের পরিমাণ এত কম যে পৃথিবীতে কোনো প্রাণ থাকার কথা নয়।"

যুল অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকে, "কী বলছ তুমি?"

"আমি দুঃখিত যুল। কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি।"

যুল দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, "তুমি বলছ পৃথিবী থেকে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে?"

"আমার তাই ধারণা। খুব নিম্ন শ্রেণীর প্রাণ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা সরীসৃপ হয়তো আছে কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী নেই।"

"কেমন করে তুমি নিশ্চিত হলে কীশ?"

"মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, তাদের একটি সভ্যতা ছিল। তারা বিজ্ঞানে খুব উন্নত ছিল। তারা যদি পৃথিবীতে বেঁচে থাকত তা হলে আমরা এখন তার চিহ্ন পেতাম। রেডিও তরঙ্গ দেখতে পেতাম, আলো দেখতে পেতাম, লেজার রশ্মি দেখতে পেতাম, পারমাণবিক বীম দেখতে পেতাম। আমরা পৃথিবী থেকে তার কোনো চিহ্ন পাচ্ছি না যুল। পৃথিবী যেন একটি মৃত গ্রহ।"

যুল খুব সাবধানে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে রাখা একটি চেয়ারে বসে পড়ে, সে এখনো পুরো ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে পারছে না। যে পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষকে দেখার জন্য সে ছায়াপথের অন্য অংশ থেকে দীর্ঘ বারো বছর অভিযান করে এসেছে সেই পৃথিবী এখন প্রাণহীন? মানুষ পুরোপুরি অবলুপ্ত? যুল এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে বড় স্ক্রিনটির দিকে নীল পৃথিবী, তার সাদা মেঘ, হালকা বাদামি স্থলভূমির দিকে তাকিয়ে থাকে। এই বিশাল পৃথিবীতে কোনো মানুষ বেঁচে নেই কেমন করে সে বিশ্বাস করবে?

কীশ একটু এগিয়ে যুলকে স্পর্শ করে বলল, "আমি খুব দুঃখিত যুল। আমি খুবই দুঃখিত।"

২

মহাকাশযানটি পৃথিবীকে ঘিরে কয়েকবার ঘুরে আসে, মহাকাশযানের সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি পৃথিবীপৃষ্ঠকে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে, কয়েক শতাব্দী আগের একটি বিধ্বস্ত সভ্যতা ছাড়া সেখানে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। ক্রন মহাকাশযানটির কক্ষপথ পরিবর্তন করে আরো নিচে নামিয়ে আনে, ক্ষীণ বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে মহাকাশযানের চারপাশে এক ধরনের অতিপ্রাকৃত আলো জ্বলে ওঠে। ভিতরে তাপমাত্রা কয়েক শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। কীশ মহাকাশযানের তথ্যকেন্দ্রে পৃথিবীর সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে যুলের কাছে জানতে চাইল সে পৃথিবীতে অবতরণ করতে চায় কি না। যুল কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে কীশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "হ্যাঁ চাই।"

"তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ পৃথিবীতে নেমে শুধু তোমার আশাভঙ্গই হবে।"

"বুঝতে পারছি, তবু আমি নামতে চাই।"

কীশ তবু একটু চেষ্টা করল, "আমরা কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের সকল তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছি। পৃথিবীতে নেমে নতুন কোনো তথ্য পাব না।"

"তবু আমি নামতে চাই। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।"

"বেশ। তা হলে আমরা মাঝারি একটা আন্তগ্রহ নভোযান নিয়ে নেমে যাই। ক্রন এই মহাকাশযানে থাকুক, আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করুক।" কীশ যুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তোমার সাথে যাই।"

যুল নিচু গলায় বলল, "আমার সাথে কারো যাবার প্রয়োজন নেই। আমি একাই যেতে পারব।"

কীশ মাথা নাড়ল। বলল, "আমি তোমাকে একা যেতে দিতে পারি না। এটি মহাকাশযানের নিরাপত্তা নীতিবহির্ভূত।"

"পৃথিবীতে কোনো জীবিত প্রাণী নেই। সেখানে কোনো বিপদ নেই কীশ।"

"হয়তো তোমার কথা সত্যি, কিন্তু আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না।"

"বেশ। তবে তাই হোক।"

কিছুক্ষণের মাঝে মহাকাশযানের আন্তগ্রহ নভোযানটিকে পৃথিবীতে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা শুরু হয়। সেটিকে জ্বালানি দিয়ে পূর্ণ করা হয়। যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়। পৃথিবীতে কিছুদিন থাকার মতো খাবার, পানীয় এবং বিশুদ্ধ বাতাস নেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বিপজ্জনক পরিবেশে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় পোশাক, ভ্রমণ করার জন্য ক্ষুদ্র ভাসমান যান এবং কোনো কাজে লাগবে না সে বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত হয়েও কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রও সাথে নিয়ে নেওয়া হয়।

ক্রন আন্তগ্রহ নভোযানে এসে কীশ এবং যুলকে তাদের নিজস্ব আসনে বসিয়ে নিরাপত্তা-বাঁধন দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দেয়। তারপর মূল দরজা বন্ধ করে তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। কিছুক্ষণের মাঝেই যুল নভোযানের ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল। নভোযানটি ধীরে ধীরে মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। যুল গোল স্বচ্ছ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে, নভোযানটি বাতাসের ঘর্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছে, তার পৃষ্ঠদেশ বাতাসের তীব্র ঘর্ষণে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। তাপ নিরোধক আস্তরণ থাকার পরও যুল মহাকাশযানের উষ্ণতা অনুভব করে। আকাশ কুচকুচে কালো থেকে প্রথমে বেগুনি, তারপর গাঢ় নীল এবং সবশেষে হালকা নীল হয়ে এসেছে। যুল নিচে তাকাল, গাঢ় নীল সমুদ্র, সাদা মেঘ এবং বহুদূরে ধূসর স্থলভূমি। যুলের এখনো বিশ্বাস হতে চায় না এই গ্রহটিতে তার পূর্বপুরুষের জন্ম হয়েছিল এবং সেই পূর্বপুরুষ গ্রহটিকে জীবনের অনুপযোগী করে ধ্বংস করে ফেলেছে।

নভোযানটি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আরো নিচে নেমে আসে, গতিবেগ কমে এসেছে, মহাকাশযানের জানালা দিয়ে সাদা মেঘগুলোকে অতিপ্রাকৃতিক দৃশ্যের মতো মনে হয়, পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও এই দৃশ্য দেখা সম্ভব বলে মনে হয় না।

কীশ কন্ট্রোল প্যানেল থেকে মাথা তুলে যুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "যুল"।

"বল।"

"আমরা গতিবেগ আরো কমিয়ে নামার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। শব্দের বাধা অতিক্রম করার সময় একটি ঝাঁকুনি হতে পারে।"

"ঠিক আছে। কোথায় নামবে?"

"এখনো ঠিক করি নি। কোনো প্রাচীন শহরের কাছাকাছি যেখানে সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া যাবে।"

যুল একটি নিশ্বাস ফেলল, কোনো কথা বলল না।

নভোযানটি সমুদ্রের তীরে একটি বড় প্রাচীন শহরের কাছে যখন খুব ধীরে ধীরে অবতরণ করল, তখন পৃথিবীর সেই জায়গায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। যুল তার আসন থেকে মুক্ত হয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল, গোধূলির নরম আলোকে পৃথিবীকে কী রহস্যময়ই না লাগছে! সে যে ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জ থেকে এসেছে সেখানে কখনো এ রকম আঁধার নেমে আসে না, সেখানে সারাক্ষণ তীব্র কৃত্রিম আলোয় আলোকিত থাকে। আলোহীন এক বিচিত্র অন্ধকার দেখে অনভ্যস্ত যুল নিজের ভিতরে এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করে।

কীশ যন্ত্রপাতি খুলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে পরীক্ষা করতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মাঝেই সে নিশ্চিত হয়ে যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের কৃত্রিম একটা ব্যবস্থা না করে এখানে যুল বের হতে পারবে না। কীশ আর্কাইভ ঘর থেকে অক্সিজেন সাপ্লাই, গ্যাস পরিশোধন যন্ত্র বের করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নিশ্বাস নেবার জন্য একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা দাঁড়া করাতে শুরু করে। যুল কীশের দক্ষ হাতের কাজ দেখতে দেখতে বলল, "কীশ।"

"বল যুল।"

"তুমি বলছ এখানে কোনো জীবিত মানুষ নেই। কিন্তু এমন তো হতে পারে পৃথিবীর কোনো একটি কোনায় এক-দুইজন মানুষ বেঁচে আছে। নিরিবিলি, কারো সাথে কোনো সম্পর্ক নেই?"

কীশের যান্ত্রিক মুখে সমবেদনার চিহ্ন ফুটে ওঠে। সে নরম গলায় বলল, "তার সম্ভাবনা বলতে গেলে নেই। পৃথিবীর বাতাসে বেঁচে থাকার মতো যথেষ্ট অক্সিজেন নেই।"

"হয়তো তারা কৃত্রিম নিশ্বাস নেবার ব্যবস্থা করে বেঁচে আছে, হয়তো—"

"তুমি কী বলতে চাইছ যুল। বলে ফেল।"

যুল একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মনে কর আমার সাথে যদি কারো দেখা হয়, আমি তার সাথে কীভাবে কথা বলব? গত কয়েক শতাব্দীতে ভাষার কত পরিবর্তন হয়েছে—"

কীশ কয়েক মুহূর্ত যুলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি নিশ্চিত তোমার সাথে কারো দেখা হবে না। কিন্তু তুমি যদি সত্যিই চাও, তা হলে তোমার মানসিক শান্তির জন্য আমি তোমার জন্য একটি ভাষা অনুবাদক দাঁড় করিয়ে দেব। পৃথিবীর যে কোনো কালের মানুষের ভাষা বোঝা নিয়ে তোমার কোনো সমস্যা হবে না।"

"ধন্যবাদ কীশ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি জানি আমি এটি ব্যবহার করার সুযোগ পাব না, তবুও কাল ভোরে বের হওয়ার সময় আমি এটা সাথে রাখতে চাই।"

কীশ স্থির দৃষ্টিতে যুলের দিকে তাকিয়ে রইল, কোনো কথা বলল না।

৩

ভাসমান যানটিতে কীশের পাশে যুল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমনিতে দেখে বোঝা যায় না, খুব ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে তার নাকের মাঝে সূক্ষ্ম এক ধরনের তন্তু প্রবেশ করেছে, তন্তু দুটি পৃথিবীর বিষাক্ত গ্যাসকে পরিশোধন করে নিশ্বাসের জন্য বিশুদ্ধ বাতাস

সরবরাহ করছে। তার কানে ক্ষুদ্র মডিউলটিতে ভাষা অনুবাদকটি বসিয়ে দেওয়া আছে, পৃথিবীর যে কোনো মানুষের ভাষা সেটি তাকে অনুবাদ করে দেবে। গলার ভোকাল কর্ডের ওপর শব্দ উপস্থাপক যন্ত্রটি যুলের কথাকেও মানুষের যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করে দেবে। কীশ নিশ্চিত যে যুল এই যন্ত্রটি ব্যবহার করার সুযোগ পাবে না কিন্তু যুল সেটি এখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করে নি।

ভাসমান যানটি পৃথিবীপৃষ্ঠের খুব কাছে গিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে যাচ্ছে, সামনে নানা ধরনের মনিটর, সেগুলো জীবন্ত প্রাণীকে খোঁজার চেষ্টা করছে। কিছু কীটপতঙ্গ এবং অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর সরীসৃপ ছাড়া পৃথিবীতে কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। নিচে শুষ্ক মাটি, শৈবাল এবং ফার্ন জাতীয় কিছু উদ্ভিদ বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কীশ তা সংরক্ষণের জন্য বেশ উৎসাহ নিয়ে কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে শৈবাল এবং ফার্নের নমুনা সংগ্রহ করছে, যুল এক ধরনের ঔদাসীন্য নিয়ে কীশের কাজকর্ম লক্ষ করে। পৃথিবী সম্পর্কে তার ভিতরে যে স্বপ্ন ছিল তা পুরোপুরি যন্ত্রণায় পাল্টে গিয়ে তাকে এক ধরনের অস্থিরতায় ডুবিয়ে ফেলছে।

ভাসমান যানটি বিস্তীর্ণ প্রাণহীন শুষ্ক মরু অঞ্চলের ওপর দিয়ে একটি বিধ্বস্ত শহরে প্রবেশ করল। কয়েক শ বছর থেকে এই শহরটি পরিত্যক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুকনো ধুলোবালুতে অনেক অংশ ঢেকে আছে, বড় বড় কিছু দালান ধসে পড়েছে, কোথাও দালানের কাঠামোটি মৃত মানুষের কংকালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। শহরের রাস্তাঘাটে ফাটল, যেটুকু অক্ষত সেখানে ধ্বংসস্তূপ এবং জঙ্গল। স্থানে স্থানে কালো পোড়া অগ্নিদগ্ধ দালানকোঠা। সব মিলিয়ে ভয়ঙ্কর মন-খারাপ-করা দৃশ্য। কীশ যানটি একটি মোটামুটি অক্ষত দালানের কাছে স্থির করিয়ে যুলকে নিয়ে নেমে আসে। দালানের ভেঙ্গে পড়া, ধসে যাওয়া দেয়ালের ফাটল দিয়ে দুজন ভিতরে ঢুকল। কীশের মাথায় লাগানো উজ্জ্বল আলোতে চারদিক আলোকিত হয়ে যায়। ধূলিধূসর ঘরের ভিতরে ওরা চারদিকে তাকিয়ে দেখে ভেঙে যাওয়া আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, যোগাযোগের যন্ত্রপাতি, প্রাচীন কম্পিউটার। কীশ তার যান্ত্রিক চোখ এবং গাণিতিক উৎসাহ নিয়ে একটি একটি জিনিস পরীক্ষা করতে থাকে, পুরোনো তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করে পৃথিবীতে ঠিক কী ঘটেছিল এবং ঠিক কীভাবে সব মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল কীশ সেটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকে। এসব বিষয়ে কীশের ধৈর্য প্রায় সীমাহীন, যুল তার কাজকর্ম দেখে অবশ্য কিছুক্ষণেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। সে কীশের কাছে গিয়ে বলল, "কীশ আমি এই অন্ধকার ঘুপচি ঘরে বসে থাকতে চাই না।"

"তা হলে কী করতে চাও?"

"বাইরে থেকে ঘুরে আসি। এই ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরটা খুব মন খারাপ করা। আমি সমুদ্র তীরে গিয়ে বসি। সমুদ্রের পানি এখনো গাঢ় নীল। বসে বসে দেখতে মনে হয় ভালো লাগবে।"

"তুমি একটু অপেক্ষা করতে পারবে? আমি একটা ক্রিস্টাল ডিস্ক পেয়েছি, মনে হচ্ছে এর মাঝে কিছু তথ্য আছে।"

"থাকুক। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।"

কীশ উঠে দাঁড়াল। বলল, "তা হলে চল। আমি এখানে পরে আসব।"

কীশ যুলকে নিয়ে আবার ভাসমান যানে উঠে বসল। সুইচ স্পর্শ করতেই ভাসমান যানের নিচে দিয়ে আয়োনিত গ্যাস বের হতে শুরু করে এবং ভাসমান যানটি সাবলীল গতিতে উপরে উঠে এসে ঘুরে দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের তীরে যেতে শুরু করে। বিস্তীর্ণ বিবর্ণ পাথর পার হয়ে ধূলিধূসর একটা অঞ্চলে চলে আসে, সেই অঞ্চলটি পার হওয়ার পরই হঠাৎ

করে আদিগন্তবিস্তৃত একটি বালুবেলা দেখা যায়। কীশ ভাসমান যানটির গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়, পিছনে ধুলো উড়িয়ে তারা ছুটে যেতে থাকে, বাতাসে যুলের চুল উড়তে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝে বিশুদ্ধ বাতাসের প্রবাহ ছাপিয়ে যুল তার নাকে সমুদ্রের নোনা পানির গন্ধ পেল। বহুদূরে নীল সমুদ্র দেখা যায়, যুল কেন জানি নিজের ভিতরে এক ধরনের চঞ্চলতা অনুভব করতে থাকে।

গ্যালাক্সির অন্য প্রান্ত থেকে যুল তার বুকের ভিতরে করে পৃথিবীর জন্য ভালবাসা নিয়ে এসেছিল। শুষ্ক বিবর্ণ বিধ্বস্ত পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপে সে এই ভালবাসা দিতে পারছিল না। নীল সমুদ্র দেখে হঠাৎ তার ভিতরে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের আবেগের জন্ম হয়, সে আবিষ্কার করে নিজের অজান্তেই তার চোখ ভিজে আসছে।

সমুদ্রের ভেজা বালুতে ভাসমান যানটিকে থামিয়ে যুল এবং কীশ নেমে এল। যুল সমুদ্রের দিকে এগিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আহা! কী সুন্দর।"

কীশ নরম গলায় বলল, "আমি শুনে খুব খুশি হয়েছি যুল যে এই সমুদ্রটি দেখে তোমার এত ভালো লাগছে!"

যুল অবাক হয়ে বলল, "তোমার ভালো লাগছে না?"

"লাগছে। কিন্তু আমি তো মানুষ নই—আমার সৌন্দর্যের অনুভূতি ভিন্ন। তোমাদের মতো এত ব্যাপক নয়—অনেক নিচু স্তরের অনুভূতি।"

যুল মাথা নেড়ে হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সমুদ্রের ঢেউ একটি একটি করে এগিয়ে আসছে, কাছাকাছি আসার পর সাদা ফেনা তুলে আছড়ে পড়ছে। ভেজা বালুতে কিছু শামুক এবং জলজ লতাপাতা। যুল হেঁটে হেঁটে পানির কাছাকাছি দাঁড়াল, ঢেউ তার কাছাকাছি এসে পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল—যুল নিজের ভিতরে এক ধরনের শিহরন অনুভব করে।

যুল আরো এক পা এগিয়ে যেতেই কীশ পিছন থেকে সতর্ক করে বলল, "বেশি কাছে যেও না যুল, ঢেউয়ের আঘাতে তোমাকে পানিতে টেনে নেবে।"

যুল মাথা নাড়ল, বলল, "নেবে না। মানুষের শরীরের অর্ধেক থেকে বেশি পানি। পানির সাথে মানুষের এক ধরনের ভালবাসা আছে। আমি শুনেছি। প্রাচীনকালে পানিকে নাকি বলত জীবন!"

কীশ একটু এগিয়ে এসে বলল, "তবু সাবধান থাকা ভালো। ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জে এরকম সমুদ্র নেই, এত পানি একসাথে আমরা কখনো দেখি নি। পানির সাথে কীভাবে বেঁচে থাকতে হয় তুমি-আমি জানি না।"

যুল অন্যমনস্কভাবে বলল, "কিছু জিনিস মনে হয় মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। পানির সাথে ভালবাসা হচ্ছে একটা। তুমি তো জান পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের বিকাশ হয়েছিল পানিতে।"

"জানি।"

"আগে ব্যাপারটা খুব অবাক লাগত। এখন এই বিশাল আদিগন্ত বিস্তৃত নীল সমুদ্র দেখে মনে হচ্ছে সেটাই তো স্বাভাবিক। সেটাই তো সত্যি।"

কীশ কোনো কথা বলল না। যুল ভেজা পানিতে পা ভিজিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের কাছাকাছি হাঁটতে থাকে। এক একটি ঢেউ সাদা ফেনা তুলে তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়তেই সে তার নিজের ভিতরে এক বিচিত্র আবেগ অনুভব করে। সমুদ্রের নোনা বাতাসে তার চুল, নিও পলিমারের পোশাক উড়তে থাকে। যুল নিজের ভিতরে এক ধরনের বিষণ্নতা অনুভব করে, এক সময় এই সমুদ্রতট মানুষের কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে থাকত, সেই কথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না।

কীশ কিছুক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে থাকে, আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল নীল সমুদ্র দেখে যুলের ভিতরে হঠাৎ যে ধরনের আবেগের জন্ম হয়েছে কীশ তার সাথে পরিচিত নয়, তার পক্ষে সেটা অনুভব করাও সম্ভব নয়। যুল সমুদ্রতীর থেকে এখন খুব সহজে ফিরে যাবে বলে মনে হয় না। কীশ কিছুক্ষণ যুলকে লক্ষ্য করে ভাসমান যানটিতে ফিরে গেল মিছিমিছি সময় নষ্ট না করে, একটু আগে বিধ্বস্ত দালান থেকে সে যে ক্রিস্টাল ডিস্কটি উদ্ধার করেছে তার ভিতর থেকে কোনো তথ্য বের করা যায় কি না সেটাই চেষ্টা করে দেখবে।

কিছুক্ষণের মাঝেই কীশ ক্রিস্টাল ডিস্কে একটা বিচিত্র জিনিস আবিষ্কার করে, এখানে মানুষের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঠিক আগে পৃথিবীতে কী হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু অস্পষ্ট তথ্য আছে। পৃথিবীর বাতাসের বিষক্রিয়া, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, বিষাক্ত গ্যাসের কবল থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য কী করা হয়েছিল তার আভাস দেওয়া আছে। সে সম্পর্কে তথ্য কোথায় পাওয়া যেতে পারে সেটি নিয়েও কিছু গোপন তথ্য রয়েছে।

কীশ খুব কৌতূহলী হয়ে ওঠে, ক্রিস্টাল ডিস্কটা হাতে নিয়ে সে দ্রুত পায়ে হেঁটে যুলের কাছে হাজির হল। যুল কীশকে দেখে একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে কীশ! তোমাকে মানুষের মতো উত্তেজিত দেখাচ্ছে!"

"তুমি ঠিকই বলেছ। আমার ভিতরে উত্তেজনা থাকলে আমি মানুষের মতোই উত্তেজিত হতাম।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"ক্রিস্টাল ডিস্কটা বিশ্লেষণ করে কিছু চমকপ্রদ তথ্য পেয়েছি।"

"কী তথ্য?"

"এই পৃথিবীতে মানুষের শেষ মুহূর্তের তথ্য। যখন মানুষ বুঝতে পেরেছে এই পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে না তখন তারা কী করেছে তার তথ্য।"

যুল একটু চমকে উঠে কীশের দিকে তাকাল, "কী করেছে?"

"আমি এখনো জানি না। এই ক্রিস্টাল ডিস্কে সেই তথ্য নেই, কিন্তু কোথায় আছে তার আভাস দেওয়া আছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমি সেটা খুঁজে বের করতে চাই।"

"আমার কোনো আপত্তি নেই।"

"তা হলে চল যাই।"

যুল একটু ইতস্তত করে বলল, "আমার সেই ধ্বংসস্তূপে যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও আমি এখানে এই সমুদ্রতীরে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

কীশকে কয়েক মুহূর্ত বেশ বিভ্রান্ত দেখায়। সে একটু ইতস্তত করে বলল, "সেটা হয় না যুল। নিরাপত্তা বিধানে স্পষ্ট করে লেখা আছে মানুষকে বিপজ্জনক পরিবেশে কখনো একা রাখতে হয় না।"

যুল হেসে ফেলল, বলল, "এটা মোটেও বিপজ্জনক পরিবেশ নয় কীশ! এটা পৃথিবী।"

"কিন্তু এটা বাসযোগ্য পৃথিবী নয় যুল। এই পৃথিবীতে বিশুদ্ধ বাতাসের প্রবাহ ছাড়া তুমি এক মিনিটও বেঁচে থাকতে পারবে না।"

"কিন্তু আমার ফুসফুসে তো বিশুদ্ধ বাতাসই যাচ্ছে। একুশ ভাগ অক্সিজেন উনআশি ভাগ বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন।"

"কিন্তু—"

"কোনো কিন্তু নেই। তুমি যাও। ঐ মনখারাপ ঘরে তোমার যেটা খোঁজাখুঁজি করার ইচ্ছে সেটা খুঁজে বেড়াও। আমি এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

কীশ কোনো কথা না বলে যুলের দিকে তাকিয়ে রইল। যুল বলল, "তা ছাড়া তোমার সাথে তো যোগাযোগ মডিউল রয়েছে, তুমি যেখানেই থাক আমাকে দেখতে পাবে। আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। যদি সত্যিই কোনো বিপদ হয় তা হলে তুমি চলে এসো আমাকে উদ্ধার করার জন্য।"

"ঠিক আছে। আমি তা হলে যাচ্ছি। তুমি এখানে থাক—সমুদ্রের বেশি কাছে যাবে না।"

"যাব না।"

"তোমাকে কিছু খাবার পানীয় দিয়ে যাচ্ছি। এবং একটা অস্ত্র।"

"অস্ত্র?"

"হ্যাঁ, আমি জানি সেটা তোমার ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন হবে না, কিন্তু তবু দিয়ে যাচ্ছি। সাথে রেখো।"

"বেশ।" যুল হেসে ফেলল, বলল, "যদি সত্যি কোনো জীবন্ত প্রাণী আমাকে আক্রমণ করে সেটা কি একটা আনন্দের ঘটনা হবে না? তার অর্থ হবে পৃথিবীতে এখনো প্রাণ রয়েছে।"

কীশ মাথা নাড়ল, বলল, "সেটি তুমি সত্যিই বলেছ যুল। সেটি এক অর্থে আসলেই আনন্দের ঘটনা হবে। তবে তুমি যদি তখন নিজেকে রক্ষা করতে পার সেটি হবে দ্বিগুণ আনন্দের ঘটনা।"

কিছুক্ষণের মাঝেই যুল দেখল প্রচণ্ড গর্জন করে ভাসমান যানটি বালু উড়িয়ে উত্তর দিকে যেতে শুরু করেছে।

৪

যুল একাকী সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে থাকে, সামনে যত দূর চোখ যায় সমুদ্রের আশ্চর্য নীল জলরাশি। সে অন্যমনস্কভাবে বাম দিকে তাকাল। বহু দূরে আবছা ছায়ার মতো কিছু উঁচু-নিচু পাহাড়, তার পাদদেশে সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ ঝাপটা দিয়ে পড়ছে। দৃশ্যটি নিশ্চয়ই অভূতপূর্ব—যুল নিজের অজান্তেই সেদিকে হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে তার হঠাৎ একটি বিচিত্র জিনিস মনে হল। এক সময় এই পৃথিবীতে লক্ষকোটি মানুষ বেঁচে ছিল, এখন এখানে সে একা। সমস্ত পৃথিবীতে সে একমাত্র জীবিত মানুষ—ব্যাপারটি সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না।

যুল হাঁটতে হাঁটতে একসময় উঁচু-নিচু পাহাড়ি এলাকার কাছাকাছি হাজির হল, ঢাল বেয়ে সে ধীরে ধীরে উপরে উঠে এসেছে, সমুদ্রের পানি নিচে পাথরে আছড়ে পড়ছে। যুল একটা বড় পাথরে বসে দীর্ঘসময় নিচে তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে। সামনে বড় পাথরের দেয়াল খাড়া উঠে গেছে, তার পাশ দিয়ে সরু চিলতে একটা ফুটো, একটু অসাবধান হলেই অনেক নিচে গিয়ে পড়বে। একা সম্ভবত এদিক দিয়ে যাওয়া উচিত নয়, হঠাৎ করে একটা দুর্ঘটনা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু যুল কী ভেবে সেই সরু ফুটো দিয়ে পাথর আঁকড়ে হাঁটতে থাকে, কিছুক্ষণের মাঝেই সে একটা খোলা অংশে চলে আসে।

হঠাৎ করে খানিকটা জায়গা সমুদ্রের অনেক ভিতরে ঢুকে গেছে। যুল উঁচু-নিচু পাথর অতিক্রম করে সাবধানে সামনে এগিয়ে যায়, পাথরের একেবারে কিনারায় এসে সে দাঁড়াল, নিচে সমুদ্রের নীল পানি, পানির গভীরতা নিশ্চয়ই অনেক বেশি, কারণ এখানে কোনো বড় ঢেউ নেই। শান্ত বাতাসের সঙ্গে ছোট ছোট নিরীহ ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। তীরে যেরকম সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছিল, এখানে সে রকম কিছু নেই। চারপাশে এক ধরনের সুমসাম নীরবতা, পরিবেশটি অনেকটুকু অতিপ্রাকৃত। যুল একটা বড় পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়াল এবং হঠাৎ তার মনে হল সে এখানে একা নয়। যুল কেমন যেন চমকে ওঠে, অনুভূতিটি এত জীবন্ত সে একবার মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল। চারপাশে কেউ কোথাও নেই, তবুও তার ভিতরে অন্য কারো উপস্থিতির অনুভূতিটি জেগে রইল।

যুল সাবধানে আরো একটু সামনে এগিয়ে যায়, নিচে শান্ত গভীর নীল পানি, উপরে মেঘহীন নীল আকাশ। সমুদ্রের বাতাস বইছে, বাতাসে এক ধরনের নোনা গন্ধ। যুল হঠাৎ আবার চমকে ওঠে, হঠাৎ করে আবার তার মনে হয় কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে। চারদিকে তাকাল, কোথাও কেউ নেই, তা হলে কেন তার মনে হচ্ছে কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে?

যুল হঠাৎ নিজের ভিতরে এক ধরনের ভীতি অনুভব করে, কোনো কিছু না জানার ভীতি, না বোঝার ভীতি। সে একটু পিছনে সরে এসে বড় একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসতে চাইল, এক পা পিছিয়ে আসতেই হঠাৎ করে ছোট একটা নুড়ি পাথরে তার পা হড়কে যায়। যুল তাল সামলে কোনোমতে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার তার পা হড়কে যায় এবং কিছু বোঝার আগেই সে পাথরের গা ঘেঁষে গভীর সমুদ্রের পানিতে গিয়ে পড়ল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে এত অবাক হয়েছিল যে তার মাঝে আতঙ্ক বা ভীতি পর্যন্ত জন্মাবার সময় হয় নি।

পানিতে ডুবে যেতে যেতে যুল হঠাৎ করে বুঝতে পারল মানুষের দেহ আসলে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না। ভেসে থাকতে হলে সাঁতার নামক একটি অত্যন্ত প্রাচীন শারীরিক প্রক্রিয়া অনেক কৌশলে আয়ত্ত করতে হয়। ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জে পানির পরিমাণ এত কম যে সাঁতার শেখা দূরে থাকুক, সেখানে কোনো মানব সন্তানই কখনো পানিতে নিজের পুরো দেহকে ডোবাতে পারে নি।

পানিতে ডুবে গেলেও যুল খুব বেশি আতঙ্কিত হল না কারণ তার মনে আছে নিশ্বাস নেবার জন্য দুটি সূক্ষ্ম তন্তু তার নাকে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবাহিত করছে। যুলের বুকের কাছাকাছি যোগাযোগ মডিউলটি এতক্ষণে নিশ্চয়ই কীশের কাছে তথ্য পৌঁছে দিয়েছে এবং কীশ তাকে উদ্ধার করার জন্য একটা ব্যবস্থা করবেই।

সমুদ্রের শীতল পানিতে যুলের শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, চোখের সামনে পানি এবং সেই পানির নিচের জগতটি একটি অবাস্তব জগতের মতো মনে হয়। যুল হাত নেড়ে কোনোভাবে ভেসে ওঠার চেষ্টা করতে করতে একবার নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করে এবং হঠাৎ করে আবিষ্কার করে সে নিশ্বাস নিতে পারছে না। যে তন্তুটি তার নাকে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করছিল পানির নিচে সেটি কাজ করছে না। কেন কাজ করছে না সেটি বোঝার চেষ্টা করে লাভ নেই, সমুদ্রে পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে কিছু একটা ঘটে গেছে, তন্তুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কিংবা বাতাসের চাপের সমতা নষ্ট হয়ে গেছে—কিন্তু সেটি এখন আর বিশ্লেষণ করার সময় নেই, সে নিশ্বাস নিতে পারছে না সেটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা!

যুল হঠাৎ করে এক ধরনের ভয়াবহ আতঙ্ক অনুভব করে, সে আরো একবার নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নাকে-মুখে লোনা পানি প্রবেশ করে। সে পাগলের মতো ছটফট করে উপরে উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু কোনো লাভ হয় না, সমুদ্রের পানির আরো গভীরে নেমে যেতে থাকে। যুল নিশ্বাস নেবার জন্য আবার চেষ্টা করল কিন্তু নিশ্বাস নিতে পারল না। তার সমস্ত বুক একটু বাতাসের জন্য হাহাকার করতে থাকে, সে মুখ হাঁ করে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করতে থাকে। ছটফট করতে করতে সে বুঝতে পারে সে চেতনা হারিয়ে ফেলছে, তার চোখের সামনে একটি কালো পরদা নেমে আসছে—সবকিছু শেষ হয়ে জীবনের ওপর যবনিকা নেমে আসছে! তা হলে এটাই কি মৃত্যু? এটাই কি শেষ?

যুলের দেহ শিথিল হয়ে আসে, সে পানির গভীরে নেমে যেতে থাকে, হিমশীতল পানিতে নিজের অজান্তেই তার দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার অচেতন মস্তিষ্কে ছায়ার মতো দৃশ্য ভেসে যেতে থাকে। তার শৈশব-কৈশোর এবং যৌবনের দৃশ্য ছাড়া-ছাড়াভাবে মনে হয়, প্রিয়জনের চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বুকের মাঝে আটকে থাকা বদ্ধ নিশ্বাসে মনে হয় তার বুক ফেটে যাবে—এখন মৃত্যুই বুঝি শান্তি নিয়ে আসবে—সেই মৃত্যু কি এগিয়ে আসছে? কোমল চেহারার একটি অপার্থিব মানবী তার দিকে এগিয়ে আসছে, তার মুখের ওপর মুখ নামিয়ে মেয়েটি তার ঠোঁট স্পর্শ করল। এটাই কি মৃত্যু? যুল চোখ বন্ধ করল, সকল যন্ত্রণা হঠাৎ করে যেন দূর হয়ে গেল। বুকভরে সে যেন নিশ্বাস নিতে পারল। যুলের মনে হল তাকে ঘিরে অসংখ্য মানবী নৃত্য করছে। সে চোখ খুলে তাকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তাকাতে পারল না। হঠাৎ করে তার চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার নেমে এল।

এটিই কি মৃত্যু? যুল উত্তর খুঁজে পেল না।

৫

নভোযানের নিরাপদ বিছানা থেকে উঠে বসে যুল অপরাধীর মতো কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার জীবন রক্ষা করার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

কীশ কোনো কথা বলল না, এক ধরনের ভাবলেশহীন মুখে যুলের দিকে তাকিয়ে রইল। যুল আবার বলল, "আমি খুব দুঃখিত তোমাকে এত বড় ঝামেলার মাঝে ফেলে দেওয়ার জন্য।"

কীশ এবারেও কোনো কথা বলল না, যদি সে একটি বায়োবট না হত তা হলে যুল নিশ্চয়ই ভাবত কীশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। যুল তার বিছানা থেকে নামার জন্য পা নিচে নামিয়ে বলল, "কীশ, সত্যিই আমি খুব দুঃখিত—তুমি হয়তো বিশ্বাস করছ না, কিন্তু আমি সত্যিই বলছি।"

"আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করছি না যুল— আমি তোমার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করেছি। তবে—"

"তবে কী?"

"আমার ধারণা ছিল আমি মানুষকে বুঝতে পারি, কিন্তু আজকে আমি আবিষ্কার করেছি যে আমি মানুষকে বুঝতে পারি না। মানুষের মাঝে নিজেকে নিজের ধ্বংস করে ফেলার একটা প্রবণতা রয়েছে। সম্পূর্ণ অকারণে মানুষ নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে।"

যুল একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "সেটি সত্যি নয়। আমি মোটেই নিজেকে ধ্বংস করতে যাচ্ছিলাম না। আমি—"

"তুমি যেখানে উপস্থিত হয়েছিলে এবং যেভাবে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছ তার সঙ্গে আত্মহত্যার খুব বেশি পার্থক্য নেই।"

"সেটি সত্যি নয়। যেটা ঘটেছে সেটা একটা দুর্ঘটনা।"

"যে দুর্ঘটনা আহ্বান করে আনা হয় সেটি দুর্ঘটনা নয়, সেটি এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা। আর যে নির্বুদ্ধিতার জন্য জীবন বিপন্ন হতে পারে সেটি আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়।"

যুল দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বলল, "কিন্তু তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে এটি একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আমি শুনেছিলাম মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মানুষের চোখের সামনে তার পুরো স্মৃতি ভেসে যায়; কথাটি সত্যি—আমি আমার শৈশবের অনেক দৃশ্য দেখেছি। যখন কিছুতেই নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না, জীবনের সব আশা ছেড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলাম, তখন দেখলাম একটি নারীমূর্তি আমার কাছে এগিয়ে আসছে, এসে আমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে আমাকে চুমু খাচ্ছে! আমি ভেবেছিলাম সেটা নিশ্চয়ই মৃত্যুদূত!"

কীশ কোনো কথা না বলে যুলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যুল একটু অবাক হয়ে বলল, "তুমি এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?"

"এমনি।"

"কী হয়েছে? আমি কি কিছু ভুল বলেছি?"

"যে নারীমূর্তি তোমাকে চুমু খেয়েছে তার চেহারা তোমার মনে আছে?"

"না, পুরো ব্যাপারটি ছিল এক ধরনের কাল্পনিক দৃশ্য, এক ধরনের হেলুসিনেশান। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় যেরকম দৃষ্টিভ্রম হয় সেরকম। শুধু একটি জিনিস মনে আছে—আমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল নিশ্বাস নিতে না পারার কষ্টটা কেটে গেল। সম্ভবত আমার মস্তিষ্ক তখন আমার শারীরিক যন্ত্রণার অনুভূতি কেটে দিয়েছিল। আমি শুনেছি মানুষ যখন অনেক কষ্ট পায় তখন কষ্টের অনুভূতি চলে যায়।"

কীশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুলের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, "তুমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান একজন মানুষ যুল। অত্যন্ত সৌভাগ্যবান একজন মানুষ। তুমি একেবারে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছ।"

"সেজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ কীশ। তুমি যদি ঠিক সময়ে গিয়ে আমাকে রক্ষা না করতে—"

"আমি তোমাকে রক্ষা করি নি যুল।"

যুল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে বলল, "তুমি কী বলছ কীশ?"

"আমি তোমাকে রক্ষা করি নি।"

"তা হলে?"

"যোগাযোগ মডিউলে সঙ্কেত পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি তোমার অচেতন দেহ সমুদ্রের বালুবেলায় শুয়ে আছে।"

যুল হতচকিতের মতো কীশের দিকে তাকিয়ে রইল। কীশ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "আমার পক্ষে তোমাকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না, কিছুতেই আমি সময়মতো তোমার কাছে যেতে পারতাম না।"

"তা হলে?" যুল হতবাক হয়ে বলল, "তা হলে আমাকে কে রক্ষা করেছে?"

"জ্ঞান হারানোর আগে তুমি যে নারীমূর্তিটি দেখেছিলে সেটি কোনো কাল্পনিক দৃশ্য ছিল না। সে মৃত্যুদূত ছিল না।"

"তা হলে?"

"সে তোমার ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে তোমার বুকের ভিতর অক্সিজেন দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।"

ব্যাপারটি বুঝতে যুলের কয়েক মুহূর্ত সময় লেগে যায়। যখন সে বুঝতে পারে তখন সে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, কীশের কাঁধ ধরে বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

"তোমার শরীরে যোগাযোগ মডিউলে আমি দেখেছি।" কীশ এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "ইচ্ছে করলে তুমিও দেখতে পার। পুরো ঘটনাটুকু রেকর্ড করা আছে।"

"কোথায়?" যুল প্রায় চিৎকার করে বলল, "কোথায়?"

"এস আমার সঙ্গে।"

কীশ নভোযানের যোগাযোগ কেন্দ্রে সুইচ স্পর্শ করতেই যুলের বুকে লাগানো যোগাযোগ মডিউলে রেকর্ড করা ছবিগুলো ভেসে আসে। প্রথম দিকের ঘটনাগুলো দ্রুত পার করে যুল সমুদ্রের পানিতে পড়ে যাওয়া থেকে দৃশ্যগুলো দেখতে শুরু করে। পানিতে তলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে এক ধরনের আধো আলো আধো ছায়ার মতো পরিবেশ হয়ে যায়। যুলকে সরাসরি দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু বাঁচার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় সে হাত-পা ছুড়ছে সেটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এক সময় সে হাঁপ ছেড়ে দিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে—চারদিকে এক ধরনের অন্ধকার নেমে আসছে এবং হঠাৎ দূর থেকে কিছু মানবী মূর্তিকে দেখা গেল, নিরাভরণ দেহে তারা জলচর প্রাণীর আশ্চর্য সাবলীলতায় তার কাছে ছুটে আসে। তাকে ঘিরে কয়েকবার ঘুরে আসে, একজন সাবধানে তাকে ধরে উপরে তোলার চেষ্টা করে, বুকের মাঝে কান লাগিয়ে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করে। নিজেদের মাঝে কিছু একটা নিয়ে বলাবলি করে তারপর একজন এগিয়ে এসে তার ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করে তার বুকের ভিতরে বাতাস ফুঁকে দিতে শুরু করে। দেখতে দেখতে যুলের দেহে সজীবতা ফিরে আসে। নারীমূর্তিগুলো যুলকে ধরে পানির উপরে তুলে এনে সযত্নে বালুবেলায় শুইয়ে রেখে আসে।

যুল হতবাক হয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "এরা কারা কীশ?"

কীশ নরম গলায় বলল, "মানুষ। পৃথিবীর মানুষ।"

"তারা কোথায় থাকে?"

"পানিতে?"

"পানিতেই?"

"হ্যাঁ। পৃথিবীর বাতাস বিষাক্ত হয়ে যাওয়ায় মানুষ পানিতে ফিরে গেছে। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে সমুদ্রের পানি থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন নেওয়ার মতো ক্ষমতা করে দেওয়া হয়েছে। এরা এখন পানিতে বেঁচে থাকতে পারে।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি নিশ্চিতভাবে জানি না। আমি অনুমান করছি। ক্রিস্টাল ডিস্ক থেকে যেসব তথ্য পেয়েছি সেখানে এ ধরনের ব্যাপারে অভাস দেওয়া হয়েছিল। মানুষকে রক্ষা করার জন্য বড় ধরনের দৈহিক পরিবর্তন করে দেওয়া। আমি তখন বুঝতে পারি নি, এখন বুঝতে পারছি।"

যুল হেঁটে হেঁটে নভোযানের জানালার কাছে দাঁড়ায়, বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশে একটা অসম্পূর্ণ চাঁদ, চাঁদের হালকা জ্যোৎস্নায় বাইরে এক ধরনের অতিপ্রাকৃতিক

পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যুল হঠাৎ করে নিজের ভিতরে এক ধরনের শিহরন অনুভব করে। এই পৃথিবীতে সে একা নয়, এখানে মানুষ আছে।

যুল কীশের দিকে তাকাল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি ওদের সাথে দেখা করতে যাব কীশ।"

"আমি জানতাম তুমি যেতে চাইবে।"

"তুমি ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না?"

কীশ নরম গলায় বলল, "আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

৬

সমুদ্রের নীল পানি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে ভাসমান যানটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যুলের শরীরের সাথে লাগিয়ে রাখা অক্সিজেন সিলিন্ডারের চাপটুকু পরীক্ষা করে কীশ বলল, "তোমার এই সিলিন্ডারে যে পরিমাণ অক্সিজেন আছে সেটা টেনেটুনে ছয় ঘণ্টা ব্যবহার করা যাবে। কাজেই তুমি এই সময়ের ভিতরে ফিরে আসবে।"

যুল মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

"সোজাসুজি উপরে ভেসে উঠো, আমি তোমাকে খুঁজে বের করব।"

"বেশ।"

"তোমার শরীরের ওপর যে পলিমারটুকু দেওয়া হয়েছে সেটা তাপ নিরোধক, তোমার ঠাণ্ডা লাগার কথা নয়। আস্তরণটুকু বেশ শক্ত—ছোটখাটো আঘাতে ছিঁড়ে যাবে না।"

"বেশ।"

"চোখের ওপর যে কন্টাক্ট লেন্স দেওয়া হয়েছে সেটি দিয়ে এখন তুমি পানির ভিতরে পরিষ্কার দেখতে পাবে। কোমরের ব্যাগে আলোর জন্য ফ্লেয়ার আছে। প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুবাদক যন্ত্র থাকল, তুমি তো জান কীভাবে ব্যবহার করতে হয়।"

"জানি।"

"চমৎকার! পানিতে সাঁতার দেওয়ার জন্য, ওঠা-নামা করার জন্য ছোট জেট প্যাকটা থাকল। যোগাযোগ মডিউলটা তো আছেই, আমি তোমার সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখব। কোনো সমস্যা হলে বা বিপদ হলে আমাকে জানাবে।"

"জানাব।"

"আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—তোমার কোমরে একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ঝুলিয়ে দিয়েছি। ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় এটি কাজ করতে পারে। আঘাত দিয়ে অচেতন করে দেওয়া থেকে শুরু করে একটা বিশাল পাহাড়কে চূর্ণ করে দিতে পারবে। আমি আশা করছি তোমার এটি ব্যবহার করতে হবে না, কিন্তু যদি ব্যবহার করতে হয় খুব সাবধান।

"তুমি নিশ্চিন্ত থাক কীশ।"

"বেশ। এবারে তা হলে তুমি যেতে পার।"

"ধন্যবাদ কীশ। তোমাকে ধন্যবাদ।"

ভাসমান যানটি পানির আরো কাছে নেমে আসে, যুল এক পাশে দাঁড়িয়ে খুব সাবধানে সমুদ্রের পানিতে নেমে পড়ে। এক মুহূর্তের জন্য শীতল পানিতে তার সারা দেহ কাঁটা দিয়ে

ওঠে, কিছুক্ষণেই তার দেহের তাপমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পলিমারটুকু উষ্ণ হয়ে উঠবে। যুল চারপাশে তাকাল, আধো আলো আধো ছায়ার একটি অতিপ্রাকৃত পরিবেশ, তার মাঝে এক ধরনের অশরীরী সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে।

যুল নিশ্বাস নিয়ে তার শ্বাসযন্ত্রটি পরীক্ষা করে দেখে, তারপর যোগাযোগ মডিউলটি স্পর্শ করে বলল, "কীশ! সবকিছু ঠিক আছে।"

"চমৎকার!"

"তোমার সঙ্গে দেখা হবে কীশ, আমি যাচ্ছি।"

"মানুষের সঙ্গে তোমার পরিচয় আনন্দময় হোক।"

যুল যোগাযোগ মডিউলটি বন্ধ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ছোট জেট প্যাকটি থেকে পানির ধারা বের হয়ে এসে তাকে সামনে নিয়ে যাচ্ছে। যুল সংবেদনশীল যন্ত্রে পানির নিচে জলজ শব্দ শুনতে শুনতে সতর্ক চোখে চারপাশে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে যেতে থাকে। এই বিশাল সমুদ্রে সে কাউকে খুঁজে পাবে না, তাকে অন্যেরা খুঁজে নেবে সেটাই সে আশা করে আছে।

সমুদ্রের নিচে থেকে প্রবালের পাহাড় উঁচু হয়ে উঠে এসেছে, সেখানে নানা ধরনের জলজ গাছ, তার ভিতরে রঙিন মাছ ছোটাছুটি করছে। উপরের পৃথিবী যেরকম প্রাণহীন, সমুদ্রের নিচে মোটেও সেরকম নয়। দেখে মনে হয় উপরের প্রাণহীন জগতের সব প্রাণী বুঝি এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

যুল প্রবাল পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামে। তাকে দেখে কিছু রঙিন মাছ ছুটে পালিয়ে গেল, পায়ের কাছাকাছি একটা গর্ত থেকে ছোট একটা অক্টোপাস দ্রুত আড়ালে সরে গেল। যুল উপরের দিকে তাকাল, সূর্যের আলোতে সমুদ্রপৃষ্ঠ বিচিত্র এক ধরনের আলোতে ঝিকমিক করছে। যুল তার জেট প্যাক চালু করে আবার সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করে হঠাৎ করে থেমে গেল, তার মনে হল সে যেন একটি নারীকণ্ঠ শুনতে পেয়েছে। যুল পানিতে আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, কোথাও কেউ নেই। যুল এই জলমানবীদের ভাষা এখনো জানে না, তাই মানুষের শাশ্বত কণ্ঠস্বরের ওপর নির্ভর করে সে বন্ধুত্বসূচক একটি শব্দ করল।

কাছাকাছি একটা পাথরের আড়াল থেকে বড় চোখের একটি মেয়ের মাথা উঁকি দেয়। যুল তার দিকে একটু এগিয়ে যেতেই মেয়েটি দ্রুত সরে গেল। যুল আবার তার আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর আবার সেই কৌতূহলী মুখটি প্রবালের পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দেয়, অবাক বিস্ময়ে যুলের দিকে তাকিয়ে থাকে। যুল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হাত তুলে মেয়েটিকে ডাকল, মেয়েটি ভয় পেয়ে আবার আড়ালে সরে যায় এবং কিছুক্ষণ পর আবার ধীরে ধীরে কৌতূহলী চোখে বের হয়ে আসে। যুল মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল এবং মেয়েটি আবার একটু এগিয়ে আসে। মেয়েটির সুগঠিত নিরাভরণ দেহ, কিছু জলজ পাতা শরীরে জড়িয়ে রেখেছে। মেয়েটি অনিশ্চিতের মতো একটু এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর ভয় পাওয়া গলায় কিছু একটা বলল। সুরেলা কণ্ঠস্বরে সঙ্গীতের স্তবকের মতো কিছু কথা।

যুল অনুবাদক যন্ত্র চালু করে রেখেছে, যান্ত্রিক কণ্ঠে সেটি অনুবাদ করে দেয়, মেয়েটি জিজ্ঞেস করছে, "তুমি কে? তোমার নাম কী?"

যুল বলল, "তুমি আমাকে চিনবে না, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। আমার নাম যুল।"

"যুল!" মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, "কী বিচিত্র নাম!"

"তোমার নাম কী?"

"আমার নাম তিনা।"

যুল মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম তিনা।"

"তুমি নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকে এসেছ, কারণ তোমার কথা খুব বিচিত্র। কিন্তু তুমি কেমন করে অনেক দূর থেকে এসেছ? তুমি তো পানিতে নিশ্বাস নিতে পার না।"

"কে বলছে পারি না। এই যে দেখ আমি পারি।"

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, "তুমি পার না, আমরা জানি।"

"কেমন করে জান?"

"আমরা দেখেছি। তুমি পানিতে নেমে নিশ্বাস নিতে পারছিলে না। তখন আমরা তোমার মুখে বাতাস ফুঁকে দিয়েছি। ছোট বাচ্চাদের যেরকম দিতে হয়!"

মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হাসতে শুরু করে, যেন অত্যন্ত মজার কোনো ব্যাপার ঘটেছে। হাসি ব্যাপারটি সংক্রামক—যুলও হাসতে শুরু করে এবং প্রবাল পাহাড়ের আড়াল থেকে নানা বয়সী আরো কয়েকজন কিশোর-কিশোরী এবং তরুণী বের হয়ে আসে। তারা পানিতে ভাসতে ভাসতে যুলকে ঘিরে দাঁড়ায়।

একটি সাহসী কিশোর যুলের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আগে পানির ভিতরে নিশ্বাস নিতে পার নি—এখন কেমন করে পারছ?"

যুল ঘুরে তার পিঠের সঙ্গে লাগানো অক্সিজেন সিলিন্ডারটি দেখাল, বলল, "এই যে দেখছ—এখানে বাতাস ভরা আছে। এই বাতাস নল দিয়ে আমার নাকে যাচ্ছে, তাই আমি নিশ্বাস নিতে পারছি।"

উপস্থিত সবার মাঝে একটা বিস্ময়ের ধ্বনি শোনা যায়। কিশোর ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, "এটা তুমি কেমন করে করেছ? বাতাস তো ধরে রাখা যায় না, বাতাস তো ভেসে ভেসে উঠে যায়।"

দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, "এত মসৃণ ঐ জিনিসটা তুমি কোথায় পেয়েছ? আমরা তো কখনো এত মসৃণ জিনিস দেখি নি?"

যুল কী বলবে বুঝতে পারল না। তার সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা মানুষের সভ্যতার কিছু জানে না। যন্ত্রপাতি দূরে থাকুক—শরীরের পোশাক পর্যন্ত নেই, যেটুকু আছে সামুদ্রিক গাছের পাতা-লতা দিয়ে তৈরি। তাদের কাছে উচ্চচাপের অক্সিজেন সিলিন্ডার বা নিও পলিমারের পোশাক বা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের কোনো অর্থ নেই। তাদের কাছে জ্ঞান বা প্রযুক্তিরও কোনো অর্থ নেই। সৃষ্টির শুরুতে মানুষ যেভাবে নিজের শরীরের শক্তি আর মস্তিষ্কের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, এখন আবার ঠিক সেই একই ব্যাপার। মানুষ আবার একেবারে সেই গোড়া থেকে শুরু করেছে। তাদের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর সে কী করে দেবে?

মেয়েটি আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে অক্সিজেনের সিলিন্ডারটি স্পর্শ করে বলল, "কোথায় পেয়েছ তুমি এটা?"

যুল একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "পৃথিবীটা বিশাল বড়, তার মাঝে কত বিচিত্র জিনিস আছে তুমি চিন্তাও করতে পারবে না।"

সবাই মাথা নাড়ল। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি বলল, "ঠিকই বলেছ তুমি, পৃথিবীটা অনেক বড়। কত কী আছে এখানে। কত রকম মাছ! কত রকম প্রাণী! কত রকম গাছ-পাথর!"

"হ্যাঁ! সেগুলো যখন তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, তখন দেখবে তার মাঝে কত কী শেখার আছে, জানার আছে। তুমি যত বেশি জানবে, দেখবে বেঁচে থাকা তত বেশি আনন্দের।"

তিনা নামের মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল, হাসতে হাসতে বলল, "তোমার কথাগুলো কী অদ্ভুত। কী বিচিত্র! তুমি কোথায় এ রকম করে কথা বলতে শিখেছ?"

যুল উত্তরে কী বলবে বুঝতে পারল না।

প্রবাল পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে যুল এবং জল-মানব এবং জল-মানবীদের সঙ্গে একটি সখ্যতা গড়ে ওঠে। যুলকে তারা সমুদ্রের আরো গহিনে নিয়ে যায়। সমুদ্রগভীরের সুপ্ত আগ্নেয়গিরির উষ্ণ পাহাড়কে ঘিরে জল-মানবদের বসতি গড়ে উঠেছে। সেখানে মায়ের সাথে সাথে শিশুরা ভেসে বেড়াচ্ছে, জন্মের পরমুহূর্ত থেকে তারা স্বাধীন। খাবার জন্য সামুদ্রিক শ্যাওলা, জলজ উদ্ভিদ আর নানা ধরনের মাছ। ঘুমানোর জন্য পাথরের ওপর শ্যাওলার বিছানা। বসতির নেতৃত্ব দেবার জন্য একজন মানবী। সমুদ্রের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য একদল সুদেহী প্রহরী, কিছু নারী কিছু পুরুষ। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রয়োজনে ভিন্ন এক ধরনের সমাজ গড়ে উঠেছে।

যুল মুগ্ধ হয়ে তাদের মাঝে ঘুরে বেড়ায়, পানিতে ভেসে যেতে যেতে একসময় সে ভুলে যায় যে সে এসেছে গ্যালাক্সির অন্য প্রান্ত থেকে, সে ভুলে যায় সে পৃথিবীর বাতাসে বেঁচে থাকা একজন মানুষ। যাদের সাথে সে ভেসে বেড়াচ্ছে তারা জলজ-মানব, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন আলাদা করে নেবার বিচিত্র দৈহিক ক্ষমতার অধিকারী।

যুল হঠাৎ করে বুঝতে পারে তারা আসলে একই মানুষ, এই পৃথিবীর একই সন্তান।

৭

নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের সামনে বসে কীশ মূল মহাকাশযানের সাথে যোগাযোগ করছে। যুলের সারা দিনের সঞ্চাহ করা সব তথ্য এর মাঝে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্রন সেগুলো মহাকাশযানের মূল তথ্য কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। যুল তার ছোট বিছানায় পা তুলে বসে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। মাথা ঘুরিয়ে কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "কীশ।"

"বল।"

"আজকে আমার যেরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কোনো তুলনা নেই।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। যেরকম আনন্দ হয়েছে সারা জীবনে আমার সেরকম আনন্দ হয় নি। কেন বলতে পারবে?"

"না। মানুষ খুব দুর্বোধ্য আমি তাদের বুঝতে পারি না।"

যুল হেসে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। আমি মানুষ হয়েই মানুষকে বুঝতে পারি না, তুমি বায়োবট হয়ে কেমন করে বুঝবে? আমার আনন্দ হয়েছে কারণ এই জল-মানব আর জল-মানবীরা একেবারে শিশুর মতো সহজ-সরল। একটা ছোট শিশুকে দেখলে যে কারণে আনন্দ হয়, ওদের দেখলে সে কারণে আনন্দ হয়।"

"ও আচ্ছা।"

যুল ভুরু কুঁচকে কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী বললে?"

"আমি বলেছি, ও আচ্ছা।"

যুল একটু উষ্ণ হয়ে বলল, "তুমি কেন ওটা বললে? তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?"

কীশ তরল গলায় বলল, "তুমি যদি আমাকে সত্যি কথা বলতে বল তা হলে আমি বলব যে আমি তোমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করছি না।"

যুল গম্ভীর গলায় বলল, "তা হলে কী কারণে আমার আনন্দ হয়েছে বলে তুমি মনে কর?"

"আমার ধারণা তিনা নামের মেয়েটির কারণে।"

যুল থতমত খেয়ে গেল এবং জোর করে মুখে একটু কাঠিন্য এনে বলল, "তুমি কী বললে?"

"আমি বলছি তিনা নামক মেয়েটির কারণে। মেয়েটি তোমার মুখে অক্সিজেন প্রবাহ করিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছিল বলে সম্ভবত তার প্রতি তোমার একটু কৃতজ্ঞতা জন্মেছে। এবারে তাকে দেখে সে জন্য তোমার নিশ্চয়ই আনন্দ হয়েছে। তা ছাড়া আরো একটি ব্যাপার—"

"কী ব্যাপার?"

"মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতি আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তবে আমার ধারণা মেয়েটি অপূর্ব রূপসী—"

যুল কীশকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "বাজে কথা বোলো না কীশ। মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।"

কীশ মাথা নাড়ল, বলল, "হতে পারে। আমি এসব ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। তবে আমি ভাসমান যানে বসে তোমার রক্তচাপ, হৃৎস্পন্দন এবং শরীরে নানা ধরনের হরমোনের পরিমাপ করছিলাম। আমি লক্ষ্য করেছি যতবার তুমি তিনা নামক জল-মানবীর কাছে গিয়েছ বা তার সাথে কথা বলেছ, তোমার রক্তচাপ এবং হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে।"

যুল খানিকক্ষণ কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "ও", তারপর সে হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—নিজের কাছে গোপন করে লাভ নেই। তিনা নামের জল-মানবী মেয়েটির কথা সত্যিই ঘুরে-ফিরে তার মনে পড়ছে। কী আশ্চর্য!

৮

ভাসমান যানের পাশে যুল পা ঝুলিয়ে বসে নিশ্বাস নেবার তন্তুটি নিজের নাকে লাগিয়ে নেয়। যোগাযোগ মডিউলটি পরীক্ষা করে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যুল কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কিছুক্ষণের মাঝেই ফিরে আসব।"

"বেশ। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমি এখনো বিশ্বাস করি তোমার দ্বিতীয়বার সমুদ্রের নিচে যাওয়াটি সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। আমরা অল্প সময়ের মাঝে পৃথিবী ছেড়ে যাব, এই সময়টুকুতে আবার এ রকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়।"

"ঝুঁকি? কিসের ঝুঁকি?"

"কত রকম ঝুঁকি। পৃথিবীর ওপরে প্রাণ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু সমুদ্রের নিচে অসংখ্য প্রাণী রয়েছে। কিছু কিছু ভয়ঙ্কর। তুমি তাদের দেখে অভ্যস্ত নও।"

"সমুদ্রের নিচে যদি জল-মানব এবং জল-মানবী পুরো জীবন থাকতে পারে, আমি তা হলে এক ঘণ্টা থাকতে পারব।"

"সেটি সত্যি। কিন্তু—"

"এর মাঝে কোনো কিন্তু নেই। আমি একজন মানব সন্তান। এই জল-মানব এবং জল-মানবীরাও মানব সন্তান। চিরদিনের মতো চলে যাবার আগে এক মানব সন্তানের অন্য মানব সন্তান থেকে বিদায় নেবার কথা।"

"সেটি সম্ভবত তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু—"

"না, কোনো কিন্তু নেই। আমি তিনাকে বলেছিলাম তার কাছ থেকে বিদায় নেব। সে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে।"

কীশ কোনো কথা বলল না, সে জানে এখানে কথা বলার বিশেষ কিছু নেই।

যুল পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর কীশ কিছুক্ষণ ভাসমান যানটিতে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাসমান যানের মনিটরে সে যুলকে দেখতে পায়, জেট প্যাক ব্যবহার করে পানির গভীরে চলে যাচ্ছে। কীশ মনিটরটি স্পর্শ করে সেটি বন্ধ করে দিল। কয়েক ঘণ্টার মাঝে নভোযানটিকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার আগেই তাকে অনেকগুলো কাজ শেষ করতে হবে। আশপাশে একটা নিরাপদ দ্বীপ খুঁজে বের করে সেখানে কিছু জরুরি আয়োজন শেষ করতে হবে। যুল ফিরে আসার আগে হয়তো শেষ করতে পারবে না—কিন্তু করার কিছু নেই।

৯

যুল ভেজা শরীরে ভাসমান যানটিতে বসে আছে। তার শরীর থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে ভাসমান যানের কিছু যন্ত্রপাতি ভিজে যাচ্ছে কিন্তু সেদিকে যুলের নজর নেই। সে দীর্ঘসময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় মাথা নামিয়ে কীশের দিকে তাকাল। বলল, "কীশ।"

"বল।"

"আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। কিন্তু ঠিক কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না।"

কীশ মাথা ঘুরিয়ে যুলের দিকে তাকাল, তার সবুজাভ চোখে এক ধরনের আলোর ছটা জ্বলে উঠে আবার নিভে যায়।

যুল নিজের আঙুলের দিকে তাকাল এবং অনাবশ্যকভাবে নখের মাথা পরিষ্কার করতে করতে আবার কীশের দিকে তাকিয়ে একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। তোমার কাছে সেটাকে অত্যন্ত বিচিত্র মনে হতে পারে—"

কীশ কোনো কথা না বলে যুলের দিকে তাকাল এবং হঠাৎ যুল কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

কীশ এবারে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং নিজের আধা জৈবিক আধা যান্ত্রিক হাত দিয়ে যুলের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, "যুল তুমি কী বলতে চাইছ আমি জানি।"

যুল হতচকিত হয়ে কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি জান?"

"হ্যাঁ। তুমি আমার সঙ্গে ক্রসিয়াস গ্রহপুঞ্জে ফিরে যেতে চাও না। তুমি এখানে থাকতে চাও। তাই না?"

যুল কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে কীশের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ, আমি এখানে থাকতে চাই।"

কীশ নরম গলায় বলল, "আমি মানুষ নই, তাই মানুষকে বুঝতে পারি না, কিন্তু তাদের সাথে এত দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি যে তারা কখন কী করবে অনেক সময় সেটা আন্দাজ করতে পারি।"

যুল কিছু বলল না। কীশ ভাসমান যানের নিয়ন্ত্রণের কাছে দাঁড়িয়ে সেটা চালু করতে করতে বলল, "আমি কাছাকাছি একটা ছোট দ্বীপ খুঁজে বের করেছি। সেখানে আমি তোমার জন্য একটা ছোট বাসস্থান তৈরি করেছি। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সেখানে আছে। জল-মানব আর জল-মানবীর শরীর থেকে কিছু জিনেটিক নমুনা সংগ্রহ করা আছে, সেটা ব্যবহার করে তোমার ফুসফুসের মাঝে পরিবর্তন আনা যাবে। কিন্তু সেটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যতদিন তুমি পানির নিচে থাকার মতো পুরোপুরি প্রস্তুত না হচ্ছ এই দ্বীপটিতে তোমাকে দীর্ঘ সময় কাটাতে হবে।"

যুল কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "কীশ—আমি তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না।" কীশ শান্ত গলায় বলল, "তুমি আর যেটাই কর আমাকে ধন্যবাদ জানিও না। আমি যেটি করছি সেটি হচ্ছে তোমার জীবনের মূল্যকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা। সেটি অমানবিক এবং অন্যায়। কিন্তু আমি সেটা করেছি তোমার জন্য—কারণ আমি জানি এটাই তোমার ইচ্ছে—"

যুল বাধা দিয়ে বলল, "কীশ, আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।"

কীশ যুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কিংবা মানুষের প্রতি আমার এক ধরনের হিংসা হয়।"

"কেন?"

"কারণ যে তীব্র অনুভূতির জন্য তুমি তোমার নিজের জীবন বিপন্ন করে ফেলতে পার আমরা সেই অনুভূতি বুঝতে পারি না।" কীশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "যাই হোক—যুল, পৃথিবীতে এখনো নানা ধরনের ব্যাক্টেরিয়া রয়েছে, সুপ্ত ভাইরাস রয়েছে, কাজেই তোমাকে সাবধান থাকতে হবে। তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে গেছি। নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করে গেছি।"

কীশ ভাসমান যানটিকে দ্বীপের মাঝামাঝি নামাতে নামাতে বলল, "নিরাপত্তার জন্য আমি তোমার কাছে কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র রেখে যাচ্ছি। তবে—"

"তবে কী?"

"তুমি সেটা ব্যবহার করতে চাও কি না সেটি তোমার ইচ্ছে। কারণ জল-মানব এবং জল-মানবীরা যদি কখনো তোমাকে সত্যিকারের একটি অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখে তারা তোমাকে ভুল বুঝতে পারে। তারা তোমাকে মনে করতে পারে কোনো অলৌকিক পুরুষ। স্বর্গের কোনো দেবতা। প্রচণ্ড ক্ষমতাধর কোনো জাদুকর।"

"তুমি ঠিকই বলেছ কীশ।"

"তবে তুমি তাদের জ্ঞান দিতে পার। নতুন জিনিস শেখাতে পার। যে জিনিস শিখতে তাদের কয়েক হাজার বছর লেগে যেত সেটা তুমি কয়েকদিনে শেখাতে পার। আমি তোমার

জন্য গ্যালাক্টিক সাইক্লোপিডিয়া রেখে যাচ্ছি, কয়েকটা ক্রিস্টালে রাখা আছে। পৃথিবীর বা জ্ঞানবিজ্ঞানের সব তথ্য তুমি সেখানে পাবে।"

ভাসমান যানটি নিচে নামাতে নামাতে কীশ বলল, "মনে রেখো আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে পৃথিবীর কিছু মানুষ অনেকগুলো শিশুকে জল-মানব আর জল-মানবীতে রূপান্তর করে সমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিল। তারা বাইরের কোনো সাহায্য ছাড়া বড় হয়েছে। তুমি তাদের মাঝে প্রথম একটি বড় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছ। একটু ভুল করলে কিন্তু সব ওলটপালট হয়ে যাবে।"

যুল কীশের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি ভুল করব না কীশ। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি কোনো ভুল করব না।"

১০

নভোযানটি প্রচণ্ড গর্জন করে আকাশের সাদা মেঘের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যুল অপেক্ষা করল। তারপর সে দীর্ঘ পদক্ষেপে বালুবেলায় হেঁটে হেঁটে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায়। সমুদ্রের ঢেউ সাদা ফেনা তুলে তার দিকে এগিয়ে পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। যুল তার মাঝে মাথা সোজা করে ঢেউ ভেঙে হেঁটে যেতে থাকে।

সমুদ্রের বালুবেলায় তার পায়ের চিহ্ন ঢেউ এসে মুছে দিতে থাকে।

ঠিক তার ফেলে আসা জীবনের মতোই।

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০০

প্রজেক্ট নেবুলা